# সেকালের কথা

রায় শ্রীজলধর সেন বাহাদুর

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

একটাকা
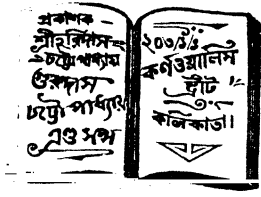
প্রকাশক —
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
২০৩/১/১
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

কুমার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

করকমলেষু—

উপহার
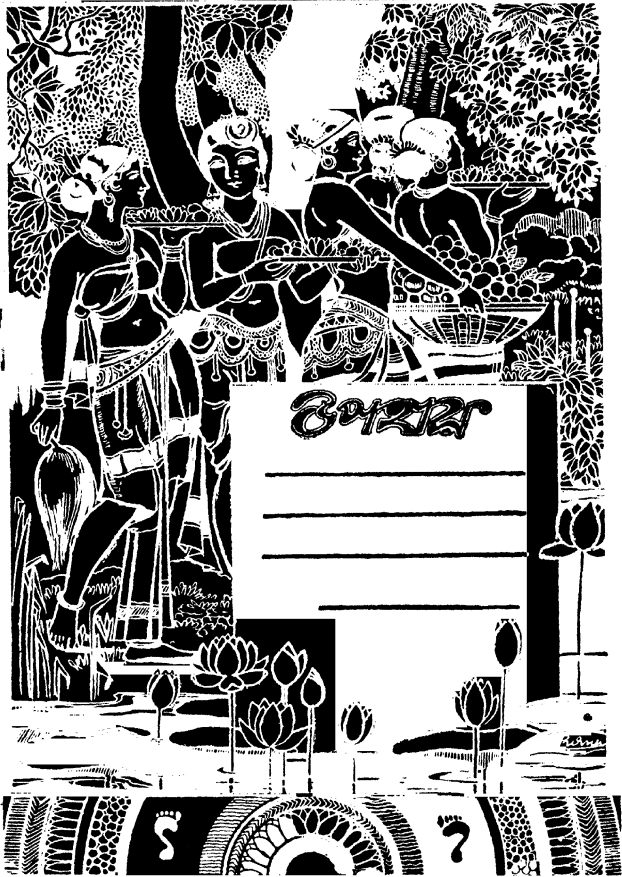
# নিবেদন

সেকালের সব মন্দ, আর একালের সব ভাল, এ ধারণা আমার নেই। সেকালেও ভাল-মন্দ ছিল, একালেও ভাল-মন্দ আছে। সকল দেশের, সকল সমাজেরই এই অবস্থা। এখনকার অনেকেই সেকালের কথা ভুলে যাচ্ছেন, তাই এই সামান্য গুটিকয়েক সেকালের চিত্র এই ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করলাম। পাঠক-পাঠিকাগণের আগ্রহ বুঝতে পারলে ভবিষ্যতে আরও কতকগুলি চিত্র প্রকাশের বাসনা মনে রইল।

লালগোলার কুমার, পরম স্নেহভাজন সুলেখক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বিশেষ আগ্রহে এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হোলো; সেই জন্য তাঁহারই নামে এখানি উৎসর্গ ক'রে আমার প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম অনুরাগের গুরুভার কিঞ্চিৎ লাঘব করবার চেষ্টা করলাম।

১লা আশ্বিন
১৩৩৭

শ্রীজলধর সেন

# সেকালের কথা

## যমজয়ী চূড়ামণি দত্ত

অনেক দিন পূর্ব্বের একটা কাহিনী বল্‌ছি। তখন বাঙ্গালায় ইংরেজের রাজত্ব আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা সহরে তখন বাণিজ্য চল্‌ছে। তখন শোভাবাজার রাজবংশের স্থাপয়িতা মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুরের অমিত প্রভাব। আমি যে ঘটনার কথা বল্‌ব, সেটী সেই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল; সুতরাং সে অনেক দিনের কথা বই কি! তখনকার আর এখনকার কলিকাতায় আকাশ-

পাতাল প্রভেদ। পঞ্চাশ বছর আগেও আমরা কলিকাতা সহরে যা দেখেছি, এখন তার চিহ্নমাত্রও নেই বল্‌লে হয়; প্রায় সবই বদ্‌লে গিয়েছে।

আমি যখনকার কথা বল্‌ছি, তখন শোভাবাজার অঞ্চলে শোভাবাজার রাজ-বংশ ছাড়া, আর দুই ঘর বড়-মানুষের বাস ছিল—এক ঘর নস্কর; আর এক ঘর দত্ত। আমি এই দত্ত বংশেরই একজন মহাত্মার বিবরণ বলছি। তাঁর নাম ছিল চূড়ামণি দত্ত। এখন গ্রে ষ্ট্রীট থেকে যে কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট বেরিয়েছে, সেই কালীপ্রসাদ দত্ত ছিলেন স্বর্গীয় চূড়ামণি দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র। এখন যেখানে স্বর্গীয় রাজা বিনয়কৃষ্ণের বৈঠকখানা, আর যেখানে গুপ্ত মহাশয়দের বাড়ী, সেই সবটা নিয়ে এবং আশে-পাশের অনেকখানি যায়গা জুড়ে চূড়ামণি দত্তের প্রকাণ্ড বাড়ী ছিল। তখন গ্রে ষ্ট্রীট ছিল না। ও-রাস্তাটা ত সে-দিন আমাদের চোখের সম্মুখে হয়েছে। ওখানে একটা ছোট গলি ছিল; তার নাম বোধ হয় ছিল গঙ্গা নস্করের গলি। এখন আর দত্তদের সে প্রকাণ্ড বাড়ীর চিহ্নমাত্রও নেই; তবে গুটি দুই স্মৃতি-চিহ্ন আছে। একটা হচ্ছে রাজা বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনের পাশে বাগানের মধ্যের একটা বটের গাছ; দত্তেরা মহা-সমারোহে সেই গাছের

প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর একটা আছে ছোট মন্দির। গুপ্ত মহাশয়দের বাড়ীর পাশেই যে খালি জমি এখন পড়ে আছে, তারই এক কোণে একটি শিবের মন্দির এখনও দেখ্তে পাওয়া যায়। ঐ মন্দিরটী দত্তদের প্রতিষ্ঠিত। আর কোনও চিহ্ন নাই। দত্ত বংশের কেউ বেঁচে আছেন কি না, তার আমি সন্ধান নিই নাই। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র কালীপ্রসাদ দত্তের নামে ষ্ট্রীট আছে, তা পূর্ব্বেই বলেছি। এখন সেই চূড়ামণি দত্ত মহাশয়ের কাহিনী নিবেদন করছি।

চূড়ামণি দত্ত সে সময় খুব বড় কারবারী লোক ছিলেন। আফিস অঞ্চলে তাঁর প্রকাণ্ড আফিস ছিল, অনেক লোকজন সে আফিসে কাজকর্ম্ম করত। তিনি নিজে মোটামুটী রকম লেখাপড়া জানতেন, কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি তাঁর খুব বেশী ছিল; বছরে অনেক টাকা রোজগার করতেন। বাড়ী ছিল প্রকাণ্ড; বড়মানুষের মতই তিনি বাস করতেন। চাকর বাকর লোকজন দেওয়ান আমলা তাঁর অনেক ছিল। যেমন রোজগার ছিল, পাল-পার্ব্বণ, দান-ধ্যানও তেমনই ছিল। তবে, তাঁর একটা মহৎ দোষ ছিল। সেটা আর কিছু নয়, তিনি অত্যন্ত রূঢ়ভাষী ছিলেন; যাকে, যা মুখে আস্ত, তাই বলেই

গা'ল দিতেন ; আর ছোট-বড়, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-নির্ব্বিশেষে সকলকেই তিনি 'শালা' এই মধুর সম্বোধনে আপ্যায়িত করতেন। এটা ছিল তাঁব বাইবের ব্যবহার ; মনেব মধ্যে তাঁর অন্য রূপ ছিল ; পরের উপকাবে তিনি একেবারে মুক্তহস্ত ছিলেন , কেউ কোন দিন কোন প্রার্থনা কবে তাঁর কাছ থেকে বিফল-মনোবথ হয়ে ফিরত না। তবে, প্রথমে কিন্তু সকলকেই সইতে হোতো তার বাক্য-বাণ ; আর তাঁর মধুর শ্যালক সম্বোধনটুকু যিনি সইতে পাবতেন, তাঁর আর ভাবনা ছিল না। লোকে সে কথা জানত, তাই কেউ গালাগালি খেয়েও রাগ করত না, হাসিমুখে সহ্য করত। একদিনেব একটা ঘটনা বললেই তাঁর সহৃদয়তার কথা বুঝতে পারা যাবে। এক রবিবাবে একটি কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ চূড়ামণি দত্তের কাছে উপস্থিত। তাঁকে দেখেই দত্ত মহাশয় বল্‌লেন 'ওবে শালা, কি জন্যে এসেছিস্‌ ? কিছু চাই বুঝি ?" ব্রাহ্মণ বল্‌ল "আজ্ঞে কন্যাদায়, তাই কিছু সাহায্য প্রার্থনা কর্‌তে এসেছি।" দত্ত মহাশয় এই কথা শুনে রেগে উঠে বল্‌লেন "ওরে শালা, বিয়ে করবার সময় চূড়ো দত্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলি ? মেয়ে জন্মাবার সময় পরামর্শ নিয়েছিলি ? এখন্‌ বিয়ে দেবার সময় যে এসেছিস্‌

বে শালা চূড়ো দত্তর কাছে ?" এই বলেই ভৃত্য রামচরণকে ডাক্‌লেন। রামচরণ এলে বল্‌লেন "দেখ শালা রামা, এই বামুনটাকে নিয়ে যা। ভাল করে ঘি-ভাত খাওয়ানোর আয়োজন করে দে।" ব্রাহ্মণের দিকে চেয়ে বল্‌লেন "যা শালা, দু'টো খেয়ে ত নে,—তার পর দেখা যাবে মেয়ের বিয়ে।"

ব্রাহ্মণ যোড়শোপচারে আহার করে অপরাহ্নে দত্ত মহাশয়ের কাছে উপস্থিত হ'লে, দত্ত মহাশয় বল্‌লেন "বল্ শালা, তোর মেয়ের বিয়েতে কত টাকা লাগ্‌বে ?" ব্রাহ্মণ ভয়ে ভয়ে অতি অল্প কিছুই চাইল। দত্ত মহাশয় বল্‌লেন "ওরে শালা, ও টাকায় কি মেয়ের বিয়ে হয় রে ! এই নিয়ে যা তিন-শ' টাকা।" এই বলে তিন-শ টাকা দিয়ে ব্রাহ্মণকে বিদায় করে দিলেন। সে সময়ের তিন-শ' টাকা এখনকার দিনে যেমন করে হোক দেড় হাজার টাকার সমান। এই রকম দান যে চূড়ামণি দত্তের কত ছিল, তা আর বলা যায় না ! যা দোষ ঐ রূঢ় বাক্য, আর শ্যালক সম্বোধন।

সেকালে কলিকাতা সহরে মোটরের নামও কেউ জানতো না ; ঘোড়া গাড়ীর প্রচলনও খুব কমই ছিল। তখন বড়মানুষেরা পাল্‌কি চড়ে যাতায়াত করতেন।

আর সে সব পাল্‌কির বাহারও খুব ছিল ; বড়মানুষদের বড় বড় পাল্‌কি. রূপো বাঁধানো ডাণ্ডা, মকর-হাঙ্গর-মুখো সাজ। আট জন বারো জন, ষোল জন বেহারা না হ'লে পালকী বইবার যো ছিল না ! চূড়ামণি দত্তও পাল্‌কিতেই আফিসে যেতেন।

একদিন তিনি যথাসময়ে পাল্‌কিতে চড়ে আফিসে গিয়েছেন। তখন আজ-কালকার মত ফাউনটেন পেন, ষ্টীল পেন এ সব ছিল না ; তখন খাগের কলমে সকলকে লিখ্‌তে হোতো। আর অনেকেই এই কলম কাটায় পারদর্শী ছিলেন ; সকল আফিসেই দুই চারজন ওস্তাদ কলম-কাটিয়ে ছিল। চূড়ামণি দত্ত মহাশয়ও খুব ভাল কলম কাট্‌তে পার্‌তেন।

আফিসে পৌঁছে, নির্দ্দিষ্ট আসনে ব'সে তিনি কলম কাটতে আরম্ভ করলেন ; এমন সময় অসাবধানতাবশতঃ ছুরিতে তাঁর আঙ্গুল একটু কেটে গেল, আর সামান্য একটু রক্ত পড়ল। তিনি অমনি আসন থেকে উঠে চেঁচিয়ে বল্‌লেন "ওরে শালারা, শীগ্‌গির বেহারাদের ডেকে দে, আমাকে এখনি বাড়ী যেতে হবে। চূড়ো দত্তর শরীর থেকে এই প্রথম রক্তপাত হোলো ! তবে ত আর সময় নেই।"

এই ব'লেই তিনি পাল্‌কিতে উঠে তখনই বাড়ী ফিরে এলেন। এসেই সোর-গোল লাগিয়ে দিলেন। প্রথমেই চাকরদের বল্‌লেন "দেখ ত অন্দরে মাগীদের খাওয়া হয়েছে কি না ; না হয়ে থাকে ত তোরা এখনই খেয়েদেয়ে নে, কেউ দেরী করিস নে। আর সেই দেওয়ান শালাকে ডেকে দে।"

সংবাদ পাওয়া মাত্র দেওয়ান এসে হাজির। তার উপর হুকুম হোলো "শালা, এখনই লোক পাঠিয়ে এক-শ' জন ঢাক-ওয়ালা নিয়ে আয়। চারটের মধ্যে এক-শ'জন ঢাকী চাই।"

দেওয়ানের সাধ্য নেই যে, কারণ জিজ্ঞসা করেন। তিনি ঢাকী গোছাতে লোক পাঠিয়ে দিলেন। তখন সহরে ঢাক ঢোল খুব মিল্‌ত, এখনকার মত নয়। এদিকে দত্ত মহাশয় আফিসের কাগজপত্র, নিজের হিসাবপত্র নিয়ে বসলেন।

চারটার সময় দেওয়ান এসে সংবাদ দিলেন, ঢাকী সব হাজির! দত্ত মহাশয় বল্‌লেন "ঐ খাটখানা উঠানে নিয়ে যা, আর তাতে বেশ ভাল করে বিছানা পাত।"

হুকুম তামিল হোলো। তিনি তখন উঠে একখানা গরদের কাপড় পরলেন, আর একখানা নামাবলী মাথায়

বাঁধলেন। তার পর বাড়ীর মেয়েদের ডেকে বল্‌লেন, "শালীরা কাঁদিস্ নে, আমি যম জিন্‌তে যাচ্ছি।" দত্ত মহাশয়ের ছেলেমেয়ে কেউ ছিল না।

তার পর উঠানে এসে দেওয়ানকে বল্‌লেন, "ওরে শালা, আমার গায়ে মাথায় ঐ দুর্গা, কালী, রাম, হরি বেটাবেটীদের নাম লিখে দে।" সে আদেশও প্রতিপালিত হোলো।

এক-শ' ঢাকী তখন উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের দিকে ফিরে বল্‌লেন, "দেখ শালারা, তোরা যে বিসর্জ্জনের বাজনা বাজিয়ে থাকিস্, তা বাজাতে পারবি নে। আমি নূতন বোল শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বোলের সঙ্গে তাল দিয়ে বাজাবি। এই শোন্।" এই বলে অঙ্গভঙ্গী করে বোল দিলেন—

"দুনিয়া জিনিয়া চূড়া
যম জিনিতে যায়,
তোরা দেখবি যদি আয়।
যম্ জিনিতে যায় রে চূড়া
যম জিনিতে যায়।"

তাঁর তালের সঙ্গে তাল দিয়ে এক-শ' ঢাক বেজে উঠ্‌ল, 'যম জিনিতে যায় রে চূড়ো, যম্ জিনিতে যায়।"

দত্ত মহাশয় তখন সেই খাটের উপর উঠে বসে বললেন, "তোল শালারা খাট। নিয়ে চল গঙ্গায়।"

তাই হোলো। এক-শ' ঢাকের বাজনা, আর সেই নূতন বোল, শুনে পাড়া একেবারে কেঁপে উঠল। কি ব্যাপার দেখবার জন্য সবাই পথে দাঁড়ালো। দেখল, এক আশ্চর্য্য দৃশ্য! খাটের উপর দেবতা-নামাঙ্কিত দেহ, মাথায় নামাবলী-বাধা চূড়ামণি দত্ত বসে আছেন। আর হাততালি দিয়ে গাইছেন—যম্ জিন্‌তে যায় রে চূড়ো যম্ জিন্‌তে যায়।

এই শোভাযাত্রা যখন মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হোলো, তখন বেলা প্রায় অপরাহ্ণ। এইখানে দত্ত মহাশয়ের আদেশে এক-শ' ঢাকী তাণ্ডব নৃত্য সহকারে বিকট রবে চীৎকার ক'রে গাইতে লাগল—"দুনিয়া জিনিয়া চূড়া যম জিনিতে যায়, তোরা দেখ্‌বি যদি আয়।" আর এক-শ' ঢাকে ঐ বোল বাজতে লাগল। মহারাজ বাহাদুর তখন ছাতের উপর বেড়াচ্ছিলেন। এত ঢাকের বাদ্য আর জনকোলাহল শুনে তিনি ছাতের পাশে রাস্তার দিকে দাঁড়ালেন। মহারাজকে দেখতে পেয়ে দত্ত মহাশয় বল্‌লেন, "রাজা, চূড়ো যম্ জিন্‌তে যাচ্ছে, সঙ্গে যাবে ত এস।"

চূড়ামণি দত্তর মাথার যে একটু গোল আছে, তা মহারাজ জান্‌তেন। এই ব্যাপার দেখে তিনি বুঝলেন দত্ত একেবারে ক্ষেপে গেছেন। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে একটু হেসে ছাতের অপর দিকে চলে গেলেন।

এই শোভাযাত্রা যখন গঙ্গাতীরে পৌঁছিল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গঙ্গাতীরে তখন লোকারণ্য হয়েছে। দত্ত মশায় আদেশ কর্‌লেন, তাঁকে খাটশুদ্ধ জলে নামানো হোক। নাভি পর্য্যন্ত গঙ্গাজলে নামিয়ে সকলে ধ্বনি দিতে লাগল "গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম!"

চূড়ামণি দত্ত মহাশয় তখন মাথার নামাবলী ফেলে দিয়ে দুই অঞ্জলি গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে বল্‌লেন, "এস যম, তোমার আজ পরাজয়!" তার পরই চক্ষু স্থির হয়ে গেল, বুকের স্পন্দন থেমে গেল। যম-বিজয়ী চূড়ামণি দত্তর পার্থিব খেলা শেষ হয়ে গেল। সকলে জয়ধ্বনি করে উঠল "জয় যম-বিজয়ী চূড়ামণি দত্তের জয়!"

এই থেকে বিসর্জ্জনের বাজনা নূতন ভাবে হল। আজকাল পূজায় এই তালেই বিসর্জ্জনের বাজনা বাজে। যমজয়ী চূড়ামণি দত্ত ইহার সৃষ্টিকর্ত্তা।

# সেকালের ভোজ

আমার এক আত্মীয় সেদিন পরলোকগত হইয়াছেন। তাহার মৃত্যুর পর, তাহার বাক্সে যে সকল দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র, খাজনার দাখিলা প্রভৃতি ছিল, সেগুলি দেখিয়া-শুনিয়া গোছাইতে গিয়া একখানি অনেক দিনের পুরাতন ফর্দ্দ আমার হাতে পড়িয়াছিল। সে ফর্দ্দখানি সেকেলে তুলট কাগজে লেখা। ফর্দ্দের সাল ঠিক করিতে আমায় বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই, যদিও ফর্দ্দে সন তারিখ কিছুই ছিল না। এই যে ফর্দ্দ বা তালিকা, তাহার উপরে লেখা আছে—শ্রীযুত

অগ্রজ মহাশয়ের প্রথম নবকুমারের শুভ অন্নপ্রাশনের আন্দাজি তালিকা। যিনি এই তালিকা লিখিয়াছেন, তাঁহার হস্তাক্ষরের সহিত আমার পরিচয় আছে। কারণ ও হাতের লেখা দশ-পনরখানা পত্র, যে কারণেই হউক, আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সুতরাং, এই নবকুমারটি যে কে এবং শুভ অন্নপ্রাশন যে কবে অর্থাৎ কোন্ বৎসরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা আমি নিসংশয়ে বলিতে পারি, মাস বা তারিখ বলিবার উপায় নাই। কারণ সে সময়ের কেহই বাঁচিয়া নাই। এই নবকুমার আর কেহই নহেন, আমার এই অল্পদিন পূর্ব্বে পর-লোকগত আত্মীয়টি। তিনি এই সেদিন ৮২ বৎসর বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। তাহা হইলে তাহার শুভ অন্নপ্রাশন যদি জন্মের পর ছয়মাসে হইয়া থাকে,—এবং যখন প্রথম নবকুমার তখন ছয় মাস বয়সেই অন্ন-প্রাশন হওয়াই খুব সম্ভব,—তাহা হইলে এই ব্যাপার ৮২ বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। আমার আত্মীয় ছয় মাস পূর্ব্বে পরলোকগত হইয়াছেন। আমার এই আত্মীয় তাঁহার পিতৃব্য বা পিতার কাগজপত্র অনুসন্ধানের সময় এই ফর্দ্দখানি পাইয়াছিলেন, এবং ইহা তাঁহারই অন্নারম্ভের ফর্দ্দ দেখিয়া অতি যত্নের সহিত মূল্যবান

দলিল-পত্রের মধ্যে রাখিয়াছিলেন ; অথচ, কথা-প্রসঙ্গে কোন দিন ৮২ বৎসর পূর্ব্বে একটা ভোজে কি কি দ্রব্য লাগিত, সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলেন নাই এবং ফর্দ্দের অস্তিত্বের কথাও প্রকাশ করেন নাই।

এই ফর্দ্দখানি আমি আজ পাঠক-পাঠিকাবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি। ইহা হইতে তাঁহারা অবগত হইতে পারিবেন—৮২ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের একটি গণ্ডগ্রামে দ্রব্যাদির কি মূল্য ছিল এবং সে সময়ে কোন বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারেও প্রথম নবকুমারের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে কি প্রকার ভোজের আয়োজন হইত এবং তাহাতে ব্যয়ই বা কত হইত।

এই ফর্দ্দের মধ্যে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে পাঠক-গণকে অনুরোধ করি। ইহাতে অন্নপ্রাশন ব্যাপারে যে ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, তাহার বিবরণ নাই ; অর্থাৎ কি কি দ্রব্য উক্ত ব্যাপারে প্রয়োজন হইত, তাহা এই ফর্দ্দ দেখিয়া জানা যাইবে না, ইহা শুধু সাধু-সেবার ফর্দ্দ। তাহা হইলেও এই ফর্দ্দ হইতে অনেক কথা জানিতে পারা যাইবে বলিয়াই আমি এইখানি এবার পূজার উপহার দিলাম।

শ্রীশ্রী দুর্গা

সহায়

শ্রীজুৎ অগ্রজ মহাশয়ের প্রথম নবকুমারের শুভ অন্নপ্রাসনের আন্দাজি তালিকা—

| | |
|---|---|
| চাউল ৫/ | ৮৶০ |
| ডাউল তিন রকম | ১॥০ |
| তৈল | ৩॥০ |
| লবণ | ॥০ |
| পান মসলা মায় সুপারি ১দফা | ১।০ |
| পাকমসলা ১দফা | ৸০ |
| তরকারী ১দফা | ২৲ |
| মৎস্য | ৬৲ |
| পান | ১॥০ |
| তামাকের লওয়াজামা | ॥০ |
| ঘৃত | ২।০ |
| মিষ্টিকাদ্রব্য | ১॥০ |
| চিড়ার ধান | ২।০ |
| খয়েন ধান | ২।০ |
| নারিকেল ৭০০ | ৯৲ |

| | |
|---|---|
| গুড় | ৫৲ |
| চিনি | ৩৲ |
| দধি | ৬৲ |
| দুগ্ধ ৫ | ৭৲ |
| | ৬৩৸৵০ |
| ওগয়েরহ | ৬ ৵০ |
| মোট | ৭০৲ |

এই ফর্দ্দে মাত্র তিনটি দ্রব্যের পরিমাণ দেওয়া আছে—চাউল, নারিকেল ও দুগ্ধ। অন্য দ্রব্যের পরিমাণ দেওয়া না থাকিলেও ব্যাপার-বিধানে যাঁহারা অভিজ্ঞ, তাঁহারা চাউলের পরিমাণ দেখিয়াই অন্যান্য দ্রব্যের পরিমাণ এবং তাহার মণকরা বা সেরকরা মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। যে ভোজে পাঁচ মণ চাউলের অন্নের আয়োজন করিতে হয়, তাহাতে তৈল, লবণ, মৎস্য, তরকারী, ডাউল প্রভৃতির পরিমাণ কত তাহা ঠিক করা সহজসাধ্য ; সুতরাং আমরা আর সে হিসাব দিলাম না। এই তালিকা হইতেই ৮২ বৎসর পূর্ব্বে কোন্ দ্রব্যের কি মূল্য ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইবে।

দুইটি বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ

করিতে চাই। তত বড় ভোজের ব্যাপারে সন্দেশ, রসগোল্লার নামও নাই। এমন কি সে সকল প্রস্তুত করিবার উপকরণেরও উল্লেখ নাই; উল্লেখ আছে শুধু সাত শত নারিকেল, পাঁচ টাকার গুড় এবং তিন টাকার চিনির; আর আছে পাঁচ মণ দুগ্ধের। আমার মনে হয়, তখন হয় ত ছানার সন্দেশের তেমন প্রচলন ছিল না, নারিকেল ও চিনি দিয়া নারিকেল সন্দেশই উক্ত ভোজে ব্যবহৃত হইয়াছিল, এবং এত বেশী যখন নারিকেল, গুড় ও চিনির আয়োজন, তখন নানাবিধ পিষ্টক যে প্রস্তুত হইয়াছিল, সে বিষয়েও সন্দেহ নাই। তবে আর একটি কথা আছে, পিষ্টক এবং পরমান্নে কি পাঁচ মণ দুগ্ধ খরচ হইতে পারে? তবে, সে সময় দেশে ম্যালেরিয়া ছিল না এবং সুভোক্তা অনেক ছিলেন, সেই যা কথা। আমরাই ছেলেবেলায় দেখিয়াছি এক-একজন ভোক্তা ভোজন-শেষে বাহাদুরী দেখাইবার জন্য আড়াই সের তিন সের পরমান্ন অনায়াসে আহার করিতেন। এ ব্যাপারও আমার জন্মের পনর ষোল বৎসর পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

গুটি কয়েক হিসাব স্পষ্টই পাওয়া যাইতেছে। আশি বৎসর পূর্ব্বে ভদ্রলোকের ভোজনের উপযুক্ত

চাউলেব মূল্য ছিল এক টাকা দশ আনা মণ। আর এখন ? খাঁটি দুগ্ধের মূল্য ছিল এক টাকা সওয়া ছয় আনা মণ ; এখন ঐ মূল্যে চাবি সের দুগ্ধও মিলে না। পাড়াগাঁয়ে ঐ মূল্যে বড় বেশী হয় ত আটসের দুগ্ধ মিলিতে পারে। তাহার পর মৎস্যের কথা। পাঁচ মণ চাউলেব বরাদ্দ ; সুতরাং, সে সময়েব ভোক্তার কথা বিবেচনা করিলেও, পাঁচ মণ চাউলে ছোট বড় দিয়া ছয় শত লোকের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। এই ছয় শত লোকের আহারের জন্য ছয় টাকার মৎস্য ধরা হইয়াছিল। এখন ছয় টাকার মৎস্যে পঞ্চাশ জনের অধিক লোকের আহারই হয় না ; আর তখন ছয় টাকার মৎস্যে ছয় শত লোকের আহারের ব্যবস্থা হইয়াছিল। বিশেষতঃ, যে গ্রামের কথা বলিতেছি, সেখানকার লোকে এখনও এই দুর্ম্মূল্যের দিনেও বিশেষ মৎস্য-প্রিয়। আর একটা বিষয় প্রণিধান করিবেন। এই ব্যাপার উপলক্ষে দুঃখী কাঙ্গালীর কথাও বাদ যায় নাই ; নতুবা অত চিঁড়ের ধান, খৈয়ের ধানের প্রয়োজন হইত না ; কাঙ্গালীরা বোধ হয় দুই একটা নারিকেল সন্দেশও পাইয়াছিল।

এখন ভাবি, সে কি দিনই গিয়াছে ! একালে সব

বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, স্বীকার করি ; কিন্তু ভোজন ব্যাপারে এমন অল্প ব্যয়ে বিপুল ভোজ এখন স্বপ্নাতীত। এক টাকা দশ আনা মণ চাউলও আর ফিরিবে না, দেড় টাকা মণ দুগ্ধও আর মিলিবে না ; অথচ শুনি, আমাদের সুখ-সাচ্ছল্য না কি খুব বাড়িয়াছে। অর্দ্ধাহার, অনাহার, দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা, ভেজালের আতিশয্য—এটা যদি সুখের বিষয় হয়, তাহা হইলে আমরা পরম সুখী।

পূজার সময় বিরাশী বৎসর পূর্ব্বের ভোজের ফর্দ্দ দেখিয়া যদি কেহ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, তাহা হইলেই আমার এই ফর্দ্দ দাখিল করা সার্থক হইবে।

# কেরোসিন তেল

এই লেখাটার শিরোনাম দেখে হয় ত কেহ ভাববেন, আমি কেরোসিন তেলের জন্ম-বৃত্তান্ত, তার কোষ্ঠী দাখিল করতে বসেছি। আমার সে অভিপ্রায় মোটেই নেই; আমি কেরোসিনের জন্ম-বৃত্তান্ত দিতে আসি নি; তবে কেন যে ঐ শিরোনাম দিলাম, তাই বলছি।

এখন সহরে বাস করলেও ছেলেবেলায় আমি গ্রামেই থাক্‌তাম; গ্রামেই আমাদের বাড়ী ছিল, এখনও আছে। আর আমাদের সে ছেলেবেলা—বিশ-পঁচিশ বৎসর আগের কথা নয়—প্রায় ষাট বৎসর আগের কথা। তখন আমার বয়স ছিল—এই আট নয় বৎসর। সেই সময় আমি সর্ব্বপ্রথমে কেরোসিন তেল দেখেছিলাম এবং সে কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে।

এখন ঘরে-ঘরেই কেরোসিন তেল দেখ্‌তে পাওয়া

যায়, বড় মানুষের বাড়ী থেকে আরম্ভ করে অতি দীনহীন গরিবের ঘরেও আজ কেরোসিন বর্ত্তমান। কিন্তু আমরা যখন বালক ছিলাম, তখন দেখা দূরে থাক, দ্রব্যটির নামও জানতাম না। তখন আমাদের দেশে বড়-মানুষেরা লণ্ঠনের মধ্যে নারকেল তেলের আলো জ্বালতেন, আর গরীবেরা হয় সরষের তেল, না হয় রেড়ির তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বেলে রাত্রির অন্ধকার দূর করতেন। এমন যে কলকাতা সহর, সেখানেও তখন ঐ প্রথা ছিল—বোধ হয় সে সময় গ্যাসের আলোও জ্বলেছে। কিন্তু বিজলী-বাতির কথা কেহ কল্পনা ও করতে পারতেন না। যাক্‌গে সে কথা। আমার সর্ব্বপ্রথম কেরোসিন তেল দর্শনের ইতিহাসই বলি।

আমাদের গ্রামখানি একেবারে নিছক পাড়াগাঁ ছিল না। গ্রামে অনেক ব্যবসায়ী বড়মানুষের বাস ছিল, ইংরাজী বাঙ্গালা লেখাপড়াও তখন গ্রামে প্রবেশ লাভ করেছিল। যারা অবস্থাপন্ন, তাঁরা অনেকে বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলকাতাতেও যাওয়া-আসা করতেন, আর তাঁদের মধ্যে যাঁরা যুবক-দলের ছিলেন, তাঁরা কলকাতা থেকে দেশে ফিরে কলকাতার সম্বন্ধে কত গল্প বলতেন, আর আমরা অবাক্ হয়ে সেই সব কাহিনী শুন্‌তাম এবং

বড় হ'লে কলকাতায় গিয়ে সেই আজব সহর দেখবার বাসনা মনের মধ্যে পোষণ করতাম। সেই সময় একদিন আমাদের প্রতিবেশী একটী যুবক কলকাতা থেকে বাড়ী ফিরে এলেন। তিনি বড়মানুষের ছেলে। অল্প বয়সে তাঁর পিতার মৃত্যু হওয়ায়, আমি যে সময়ের কথা বল্‌ছি তখনও, তাঁর জেঠামশাই তাঁর পোষাকী নাম প্রচলিত হতে দেন নি—শিশুকালের সেই সনাতন 'খোকা' নামই তাঁর বাহাল ছিল; আমরা অত-বড় যোয়ান মানুষটাকে খোকা-দাদা ব'লেই ডাক্‌তাম।

আমাদের এই খোকা-দাদা যখনই দু'দশ দিনের জন্য কলকাতায় গিয়ে বাড়ী ফিরে আস্‌তেন, তখনই এমন সব জিনিস নিয়ে আস্‌তেন, যা আমরা—অর্থাৎ পল্লী-বালকেরা—কখন চোখেও দেখি নি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাবান, বুরুষ, পমেটম, ফিতে, ষ্টকিন প্রভৃতির নাম বল্‌তে পারি।

আমি যেবারের কথা বল্‌ছি, সেবার তিনি বাড়ী এসেই পাড়ায় ঘোষণা করে দিলেন যে, তিনি এমন একটী আশ্চর্য্য জিনিস এনেছেন, যা আমরা ত কোন দিন দেখিই নি, আমাদের পাড়াগেঁয়ে অভিভাবকেরাও দেখেন নি। তবে সেটী দিনের বেলায় দেখিয়ে লাভ নেই, সন্ধ্যার সময় দেখাতে হবে। আর তিনি বল্‌লেন, তার

এমন গুণ যে, উঠানে বসিয়ে দিলে সারা বাড়ী আলো হয়ে যাবে—চাঁদের জ্যোছনা তার কাছে লাগেই না। এই বর্ণনা শুনেই ত' আমাদের চক্ষুস্থির। কখন বিকেল হবে, কখন সন্ধ্যা আসবে, আমরা তারই জন্য সময় গণতে লাগলাম। আর এমন একটা দ্রব্য আমাদের পাড়ায় দেখানো হবে, এ সংবাদ অন্যান্য পাড়ার ছেলেদের দিয়ে বাহাদুরী প্রকাশ করবার লোভও সংবরণ করতে পারলাম না। বাড়ীতে পিসিমা বল্‌লেন "ও-বাড়ার খোকা একটা টিনের বাক্সের মধ্যে কি একটা ভয়ানক দ্রব্য এনেছে। যে ঘরে সেই বাক্সটা রেখেছে, সে ঘরে কেউ যেন আগুন নিয়ে না যায়, এ কথা বারবার সকলকে বলে দিয়েছে। ঘরের মধ্যে কোন রকমে আগুন নিয়ে গেলে একেবারে লঙ্কাকাণ্ড হবে, তাদের বাড়ী তো পুড়ে যাবেই, পাড়াপড়শী আমাদেরও রক্ষে নেই। খবরদার, তোরা আজ ও-বাড়ীতে যাস নি, শেষে কি 'অপমিত্যু' হবে। যেমন বাতিক—মরুক গে ঐ হতভাগা!" পিসিমার নিষেধ-বাক্য আমাদের আরও উৎসাহিত করল। বিকেল না হতেই আমরা সবাই খোকা-দাদার প্রকাণ্ড উঠানে উপস্থিত হলাম। আমাদের তর সইছিল না—"খোকা-দা, কখন জিনিস

বার করবে?" "খোকা-দা, বেলা ত আর নেই"—এই রকম অনুরোধ উপরোধ আমরা ক্রমাগত করতে লাগ্‌লাম, কিন্তু তিনি সুধু বল্লেন 'এখনও দেরী আছে।'

কি করা যায়, অপেক্ষাই করতে হোলো।

অবশেষে শুভ সময় এসে পড়ল। চাকরদের কাউকে ছুঁতে না দিয়ে খোকা-দা নিজেই সেই টিনের বাক্সটা এনে উঠানের মাঝখানে রেখে দিলেন। বাক্সটী দেখ্‌বার জন্য আমরা সবাই যখন ঝুঁকে পড়লাম, তখন খোকা-দা চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন—'সর্ সর্, এত কাছে কেউ আসিস নি। পুড়ে মরবি।' এই কথা শুনে আমরা সভয়ে দশ হাত পিছিয়ে গেলাম। তিনি তখন এই দর্শক দলকে সেই বাক্সটী হ'তে দশ বার হাত দূরে গোল হয়ে দাঁড়াতে বল্‌লেন। সকলেই তাই করলাম। সুধু আমরা ছেলেমেয়ের দল কেন, বয়োবৃদ্ধেরাও এই ব্যাপার দেখতে এলেন। তার পর খোকা-দা তালা খুল্‌লেন, বাক্সের ডালা তুল্‌লেন। আমরা দূর থেকে সভয়ে দেখলাম যে, বাক্সটা খড়ে বোঝাই—আর কিছু দেখা গেল না। তিনি তখন ধীরে ধীরে সেই খড়গুলি তুলে বাইরে ফেল্‌তে লাগ্‌লেন;—আমরা ভয়ে আরও একটু পিছিয়ে গেলাম। তখন সেই খড়ের মধ্যে থেকে

যিনি বের হলেন, তাঁর পবিচয় এখন সকলেব কাছে এক কথায় দিচ্ছি। তিনি হচ্ছেন, একটী অতি সাধারণ কেরোসিনের টেবিল ল্যাম্প। সবাই হয় ত হাসছেন, কিন্তু এমন আশ্চর্য্য অদৃষ্টপূর্ব্ব দ্রব্যটী তখন আমবা যে কি ভাবে, কি সতৃষ্ণ নয়নে দেখেছিলাম, তা কেউ ভেবেও উঠতে পারবেন না।

যাক্, খোকা-দা তখন বাক্সের পার্শ্বে ল্যাম্পটী বসালেন। কেনবার সময়ই বোধ হয় দোকানদাব ল্যাম্পে ফিতে পরিয়ে দিয়েছিল ; তাই সে প্রক্রিয়াটা আর আমরা দেখ্‌তে পেলাম না। তাব পরই বাক্সেব মধ্য থেকে এলেন কাগজে মোড়া একটী দ্রব্য ; মোড়ক থেকে বের হলেন এক আশ্চর্য্য বস্তু। আমবা কখনও দেখি নি, তাই আশ্চর্য্য মনে হয়েছিল। তিনি আর কেউ নন, একটা পেট-মোটা মাথা-সরু কাচের চিম্‌নি! সে রকম চিম্‌নি এখন আর বাজারে বড়-একটা দেখ্‌তে পাই নে।

এই সব ত বেব হোলো ; কিন্তু আসল যিনি, তিনি তখনও বাক্সের মধ্যেই রয়েছেন। এইবার খোকা-দাদা বল্‌লেন, "তোমরা সবাই আরও স'রে যাও—এখন যা বা'র ক'রব, সে অতি ভয়ানক জিনিস। তার নাম হচ্ছে

'ক্রাচিন'"। আমরা তখন ভয়ে আরও পিছিয়ে গেলাম। খোকা-দাদা তখন একটা জিনিস বাক্স থেকে বার করলেন ; তার আকার যে কি, প্রথমে ঠাহর হোলো না—প্রকাণ্ড একটা কাপড়ের পুঁটুলি দেখ্‌লাম। তিনি ধীরে ধীরে সেই কাপড়ের আবরণ খুলতে লাগলেন। পূরা দশ হাত একখানি ধুতি লম্বার দিকে চার পাট করে সেই ভয়ঙ্কর দ্রব্যটীকে বেড়ে রাখা হয়েছে। কাপড়ের বন্ধন আর শেষ হয় না—এ যেন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। এই বস্ত্রের বেষ্টনী যখন শেষ হোলো, তখন দেখা গেল একটা আধসেরী বোতল। সেই বোতলটী অতি সন্তর্পণে তুলে ধরে খোকা-দাদা ঘোষণা করলেন, "এর মধ্যে যে জলের মত জিনিস দেখ্‌তে পাচ্ছ, তার ন'ম ক্রাচিন। এই ক্রাচিন ল্যাম্পের মধ্যে ঢেলে দিয়ে, পল্‌তেয় আগুন জ্বেলে দিয়ে চিমনি লাগিয়ে দিলে একেবারে চাঁদের আলো।" এই ব'লে তিনি ল্যাম্পের স্ক্রু খুলে অতি সাবধানে খানিকটা তেল ল্যাম্পের তৈলাধারে ঢেলে দিয়ে স্ক্রুটা আট্‌কে দিলেন।

তার পর পলতে জ্বেলে দেবার পালা। খোকাদা-দার বুড়া জ্যাঠামশাই এতক্ষণ কিছু বলেন নি, সমস্তই দেখ্‌ছিলেন। যখন ল্যাম্প জ্বালবার কথা হোলো, তখন

তিনি বল্‌লেন, "তোকে এখন ও সর্ব্বনেশে জিনিসের কাছেও যেতে দেব না খোকা! তুই সরে আয়, চাকরেরা কেউ জ্বেলে দিক্।" তিনি ত বল্‌লেন, চাকররা জ্বেলে দিক; কিন্তু সকলেরই মনে খোকা-দাদা যে ভয়ের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন, তাতে অন্য লোক দূরে থাক, মাইনের চাকরেরাও কেউ প্রাণ দিতে স্বীকার হোলো না।

শেষে স্থির হোলো যে,একটী প্যাঁকাটীর মাথায় আগুন জ্বেলে দূর থেকে ল্যাম্পের পলতে জালিয়ে দিতে হবে। সেই মত ব্যবস্থা হলে আমাদের পাড়ার একজন গাঁজাখোর কিঞ্চিৎ দক্ষিণার লোভে এই অসমসাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হোলো। সে যথাসম্ভব দূরে থেকে ল্যাম্পের পল্‌তেয় অগ্নি সংযোগ করল। আলো হোলো, কিন্তু বেশ জোর হোলো না। তখন খোকা দাদা বল্‌লেন, "পাশে যে চিম্‌নি রয়েছে, ওটা লাগিয়ে না দিলে আলো খুল্‌বে না।"

গাঁজাখোরটি সে ভারও নিল। সে অতি সন্তর্পণে ল্যাম্পের কাছে গেল, চারিদিকে রব উঠল—খবরদার, সাবধান! গাঁজাখোর বেশ সাবধানে চিম্‌নি পরিয়ে দিল; আর তখনই চাঁদের আলো হোলো! বা কি চমৎকার!

আমাদের ভারি ইচ্ছে হচ্ছিল, আরও একটু এগিয়ে এই চাঁদের আলোটা নয়ন ভ'রে দেখি। কিন্তু এগুতে গেলেই 'ওরে, সর, সর, ল্যাম্প ফেটে যেতে পারে'—শুনেই দশ হাত পিছিয়ে যাই।

তার পর—তার পর আর কি? এখন ত ঘরে ঘরে কেরোসিন। সব কাজেই কেরোসিন। কেরোসিন এখন সর্ব্বব্যাপী। কিন্তু, এখনও, লেখাপড়া শিখেও, বানান ভুল না করেও, মধ্যে মধ্যে সেই সেকালের একদিনের কথা মনে করে ছেলেপিলেদের বলি 'ওরে, সর, সর, খবরদার, এর নাম ক্রাচিন।'

# আমার প্রথম চা-পান

উপবে নামটা দেখে কেহ কেহ হয় ত মনে কববেন, আমি চা খাওয়া ভাল কি মন্দ, তারই সম্বন্ধে একটা লম্বা চওড়া বক্তৃতা কবব। আমাব কিন্তু সে অভিপ্রায় মোটেই নেই, আমি চা খাওয়াব ভাল-মন্দেব কথাই তুলব না। আমি কি বল্‌ব জানেন?—আমি প্রথম চা পান কবেছিলাম কবে এবং সে দিন যে মহা সমাবোহ হয়েছিল, তারই কথা। এখন দেখ্‌তে পাওয়া যায় ঘবে ঘবে চা।' এমন বাড়ী আছে কি না সন্দেহ, যে বাড়ীতে চা খাওয়ার ব্যবস্থা নেই; আব বাড়ীব কর্ত্তাগিন্নী থেকে আণ্ডা-বাচ্ছা মায় ঝি চাকর, সকাল-বেলা বিছানা থেকে উঠে, কেউ বা বিছানায় শুয়েই চায়ের তাগাদা করেন;

একটু বিলম্ব হ'লেই হাই তুলতে থাকেন। সহর ব'লে নয়, এই চা মহাশয় পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছেন। কাকগুলো ভোরে উঠে যেমন 'কা, কা,' করে, আমাদেরও অনেকেই তেমনি প্রাতঃকালে বিছানা ছাড়বার সময় ভগবানের নাম না করে 'চা, চা' বলে চীৎকার করেন।

বছর কয়েক পূর্ব্বে কিন্তু চায়ের এমন প্রচলন ছিল না। এই মহৎ কার্য্যটা কে করেছেন, তাঁর একটু বিবরণ দিয়েই আমার প্রথম চা পানের ইতিহাস বল্‌ব। কলকাতায় একটা খুব বড় সাহেব কোম্পানী আছে। ছেলেরা হয় ত অনেকেই সে কোম্পানীর নাম জানেন না। তাঁদের চাইতে যাঁরা বয়সে বড়, তাঁরা সবাই এনড্রু ইউল কোম্পানীর নাম জানেন। এঁরা খুব বড় সওদাগর। এঁদের নানা রকমের ব্যবসায় আছে; তার মধ্যে একটা প্রধান হচ্ছে চায়ের ব্যবসায়। এই চা জিনিসটা কয়েক বৎসর আগে সাহেবরা ব্যবহার করতেন, আর যাঁরা সৌখীন বড়মানুষ, বা সাহেব-ঘেঁসা বা বিলাতী ধরণের ব্যক্তি, তাঁরাই অল্পবিস্তর ব্যবহার করতেন, অর্থাৎ চা পান করতেন; গৃহস্থ লোক, কি সাধারণ লোক চায়ের ভক্ত মোটেই ছিল না। আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ, আমরা ছেলেবেলায় বস্তুবিচার নামক পুস্তকে চায়ের

কথা পড়েছিলাম, আর তার ছবিও দেখেছিলাম; কিন্তু পদার্থ-টীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় মোটেই তখন হয় নি, হবার উপায়ও ছিল না। এনড্রু ইউল কোম্পানী দেখলেন যে, এ দেশের লোককে চা-খোর করতে না পারলে ত চায়ের ব্যবসায় জেঁকে উঠে না, লাভও হয় না। তাই তাঁরা এক মতলব করলেন। সকলেই জানেন যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে বুদ্ধি খাটাতে সাহেব লোকেব সঙ্গে আব কেউ সহজে পেরে উঠেন না। এই এনড্রু ইউল কোম্পানীব চায়েব প্রচলনের চেষ্টা তাব একটা প্রধান প্রমাণ।

তার পর, ব্যাপারটা বলি। কোম্পানী অনেক ভেবে-চিন্তে কি করলেন জানেন? এই কলকাতা সহবেব নানা স্থানে তৈরী চায়ের দোকান খুলে বসলেন। সে সব দোকানের ব্যবস্থা এই হোলো যে, যিনি চা খেতে আসবেন, তাঁকে অমনি চা খেতে দেওয়া হবে। কারও কাছ থেকে একটী পয়সাও নেওয়া হবে না—যার যত পেয়ালা ইচ্ছে, বিনা পয়সায় খেয়ে যাও। শুধু কি তাই। দোকান থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ছোট ছোট এক-একটা মোড়ক চা ভোজন-দক্ষিণা-স্বরূপ নিয়ে যাও। এমন সুবিধা কি কেউ ছাড়ে? জানো ত, একটা প্রবাদ আছে, বিনা পয়সায় বিষ পেলেও লোকে তা খায়।

এই বিনা পয়সায় চা-পানের এবং এক মোড়ক চা দক্ষিণার লোভে, ইতর-ভদ্র মুটে-মজুব, কারিগর, নৌকার মাঝীরা পর্য্যন্ত দেদাব চা খেতে লেগে গেল। এনড্রু ইউল কোম্পানীও দুই হাতে এই দান-খয়রাত করতে লাগ্‌লেন। তার পর, তাঁরা যখন দেখ্‌লেন যে, এ দেশের লোকের চায়ের নেশা জমে এসেছে, অনেকেই বিনা পয়সায় দোকানে বসে চা পান করে, বা বিনা পয়সায় চায়ের মোড়ক বাড়ী নিয়ে গিয়ে চা পান করতে আরম্ভ করে দিয়েছে, তখন তাঁরা চায়ের সদাব্রত অর্থাৎ দোকান তুলে দিলেন ; বিনা পয়সায় যে চায়ের মোড়ক দিচ্ছিলেন, তাও বন্ধ করে দিলেন। তখন চা-খোরের দল আর কি করবে, নেশা তখন বেশ জমেছে। তখন ঘরে ঘরে চা পানেব ব্যবস্থা হোলো, গলিতে গলিতে চায়ের দোকান ব'সে গেল। আর এখন ত দেখতে পাই, চা বিনে প্রাণ ধারণই অসম্ভব হয়েছে। সামান্য পাড়াগাঁয়েও দেখছি, বাড়ীতে বাড়ীতে চা পানের ব্যবস্থা, বাজারে তৈরী চায়ের ছোট বড় দোকান। এই যে ব্যাপার হয়েছে, এটা ঐ সাহেব কোম্পানীর কল্যাণে। প্রথম কিছুদিন বিনা পয়সায় চা দিয়ে এখন তাঁরা চায়ের ব্যবসায় কেমন জাঁকিয়ে তুলেছেন। আর শুনতে পাই, যাঁদের চায়ের

বাগান আছে, যাঁরা অংশী নিয়ে চা বাগান চালাবার ব্যবসায় করেন, তাঁরা অংশীদের শতকরা একশ টাকা পর্য্যন্ত লাভ অর্থাৎ ডিভিডেণ্ড দিয়ে থাকেন,—চায়ের ব্যবসায় এমন লাভের হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই কলকাতার মত সহরে যাঁদের তৈরী চায়েব দোকান আছে, তাঁরা প্রতি মাসে ফেলে-ছেড়ে যেমন ক'রে হোক নিতান্ত কম হলেও একশ টাকা লাভ করেন—পুঁজি কিন্তু ত্রিশ টাকা।

এই ত চা-পানের এখনকার অবস্থা। আমি যে সময়ের কথা বল্‌ছি, অর্থাৎ যখন আমার বয়স আট কি নয় বৎসব, তখন কি ভাবে প্রথম আমি চা-পান করে-ছিলাম, সেই কাহিনীটা এখন বলি।

আমার বাড়ী পাড়াগাঁয়ে, এ কথা শুনে কেহ যেন মনে না করেন যে, সেখানে ভদ্রলোকের বাস নেই; সেখানে এমন জঙ্গল যে দিনের বেলাতেই বাঘে মানুষ নিয়ে যায়; সেখানে রাস্তাঘাট নেই। যখনকার কথা বল্‌ছি, সে পঞ্চাশ পঞ্চান্ন বৎসর আগের কথা হলেও আমাদের গ্রাম একটু সহরের মতই ছিল। সেখানে অনেক ভদ্রলোকের বাস ছিল, এমন কি বাঙ্গলা ইংরাজী লেখা-পড়া শিখ্‌বারও ব্যবস্থা ছিল।

সেই সময় আমাদের গ্রামের একটী যুবক জলপাইগুড়ি অঞ্চলে, কি একটা স্থানে, পোষ্ট-মাষ্টারী করতেন। তখন সাধারণ লোকে পোষ্ট-মাষ্টারদের 'ডাকমুন্সী' ব'লে ডাকত। আমি যাঁর কথা বল্‌ছি, তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, উপাধি চক্রবর্ত্তী। তখন যাঁরা একটু ইংরাজী লেখাপড়া শিখ্‌তেন, তাঁরা বেশীমাত্রায় সাহেবী-আনা দেখাতেন, নইলে না কি, বিদ্যার মানহানি হোতো। সেই কারণেই আমাদের এই ব্রাহ্মণ যুবক তাঁর অমন সুন্দর চক্রবর্ত্তী উপাধিটাকে বিকৃত করে বল্‌তেন চেকারবেটি। আমরা তাঁকে চেকারবাবু বলে ডাক্‌তাম।

বছর দুই চাকরীর পর একবার চেকারবাবু দু'মাসের ছুটি নিয়ে দেশে এসেছিলেন। এখন যেমন আট দশ ঘণ্টার মধ্যেই রেলের প্রসাদে জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় আসা যায়, তখন সে উপায় ছিল না;—রেল তখন অত দূর যায় নি, পদ্মানদীও পার হয় নি। তখন ঐ অঞ্চল থেকে আস্‌তে হলে নৌকো ছাড়া অন্য উপায় ছিল না।

চেকারবাবু বাড়ী এলে আমরা তাঁকে দেখ্‌তে গেলাম; তিনি আমাদের প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি তখন আমাদের কাছে ঘোষণা করলেন যে, সেই দিনই সন্ধ্যার

সময় তিনি এমন একটা জিনিস খাওয়াবেন, যা আমরা খাওয়া দূরে থাক, কখন চক্ষেও দেখি নি। জিনিসটা কি, অনেক সাধ্যসাধনা করেও সে খবর জান্‌তে পারলাম না!

আমরা সেই নূতন জিনিসটি খাবার প্রলোভনে বিকেল হতে না হতেই চেকারবাবুর বাড়ীতে হাজির হলাম। আমরা ছেলের দলই নয়, চেকারবাবুর সমবয়সীদেরও তিনি এ শুভ সংবাদ দিয়েছিলেন। তাঁরাও সবাই বিকেল বেলাই এসে জুট্‌লেন।

চেকারবাবুর বাড়ীর একখানি ঘরের বারান্দায় একটা উনন ছিল। সেইটাতেই এই নূতন দ্রব্যটীর রন্ধনকার্য্য হবার ব্যবস্থা হোলো—তাঁর পিসিমা তাঁকে রান্নাঘর ছেড়ে দিতে চান নি।

বারান্দার সেই উননে চেকারবাবু একটা নূতন হাঁড়িতে জল চড়িয়ে দিয়ে হাঁড়ির মুখ একটা সরা দিয়ে ঢেকে দিলেন, আমরা তাঁর উঠানে দাঁড়িয়ে এই সব ব্যাপার দেখ্‌তে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে হাঁড়ির মুখ খুলে দেখ্‌লেন। কি দেখ্‌লেন, তখন আর তা আমরা বুঝতে পারলাম না। এখন বুঝেছি যে, জল খুব গরম হয়েছে কি না, তাই তিনি দেখেছিলেন। তার পর, অতি সাবধানে হাঁড়িটা নামিয়ে একটা কাগজের মোড়ক থেকে কালো

রঙের কি কতকগুলো নিয়ে সেই হাঁড়ির মধ্যে ফেলে দিয়ে আবার হাঁড়ির মুখ বন্ধ করে দিলেন। অল্প একটু পরেই সেই হাঁড়ির মধ্যে খানিকটা দুধ, আর আধ সের-টাক চিনি দিয়ে আবার ঢাক্‌নী দিয়ে মুখ বন্ধ করলেন। আমরা অবাক্ হয়ে এই আশ্চর্য্য রন্ধনকার্য্য দেখ্‌তে লাগ্‌লাম।

তার পর, চেকারবাবু সকলকে বল্‌লেন যে, এ দ্রব্য পান করবার জন্য কোন পাত্র তাঁর পিসিমা দেবেন না; সুতরাং, সকলকে অঞ্জলি পেতে নিয়ে এই সুধার আস্বাদন করতে হবে। এই বলে তিনি আগে তাঁর বন্ধুদের মধ্যে তাঁর এই সুধা পরিবেষণ করলেন। তার পর আমাদের বললেন, "তোরা সবাই সার বেঁধে দাঁড়া।" তথাস্তু! আমরা সবাই তাই করলাম। তিনি তখন সেই সরায় ক'রে আমাদের করপুটে এই সুধা বণ্টন করে দিলেন। ঠাকুরবাড়ীতে গিয়ে আমরা যে একটু চরণামৃত নিই, এই সুধার পরিমাণ তার চেয়ে বেশী নয়। চেকার-বাবু বল্‌লেন, "এর নাম 'চা'—বুঝলি। এ বেশী খেলে মাথা ঘোরে—নেশা হয়, আর রাত্রে ঘুম হয় না। তাই তোদের একটু পরিমাণে দিলাম।" আমরা সেই একটু চা পান করে ভয়ে ভয়ে তখনই বাড়ী ফিরে গেলাম,—

কি জানি, তখনই যদি মাথা ঘুরে উঠে, তা হলে ত মহা বিপদ ! সে রাত্রে কিন্তু আমাদের মাথাও ঘোরে নি, অনিদ্রাও হয় নি—আমরা কোন অসুখই বোধ করি নি। আর এখন ত' তিন বছরের ছেলেমেয়ে ঘুমের ঘোরেই বলে 'মা, চা ?' এখন আর মাথাও ঘোরে না, অনিদ্রাও হয় না। এই আমার প্রথম চা-পানের ইতিহাস। এখন মনে করলেও হাসি পায়। এখন দিনে-রাতে পাঁচ-সাত পেয়ালা চা পান করেও মাথা ঘোরে না, রাত্রে অনিদ্রাও হয় না ; নেশাও মোটেই হয় না। লাভ যে কি হয়, তা ত বুঝিনে।

# সেকালের বাল্য-বিবাহ

আমি তখন বাঙলা স্কুলে পড়ি, আর তখন আমার বয়স এগারো বারো বৎসর; সুতরাং, সে যে অনেক দিন পূর্ব্বের কথা, তা না বললেও চলে। সেই সময় আমি একটা বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলাম। সেই বিয়েতে আমি যে একটা দৃশ্য দেখেছিলাম, তা এতদিন পরেও আমার বেশ মনে আছে। সেই কথাটাই আজ বলছি।

আমাদের প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের বিবাহ। এ তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ। তাঁর বয়স তখন এই বত্রিশ

কি তেত্রিশ বৎসব। প্রথম পক্ষের একটী ছেলে বর্ত্তমান। তার বয়স তখন নয় কি দশ বৎসর।

তিনি পুনবায় বিবাহ করতে চান নাই, কিন্তু মায়ের একমাত্র সন্তান। মা জেদ ধবে তাঁকে বিবাহে সম্মত করান!

দ্বিতীয় পক্ষেব বিবাহ ব'লে বর মহাশয় কোন প্রকাব আড়ম্বর করতে প্রথমে সম্মত হন নাই, তাঁব ইচ্ছা ছিল, নাপিত পুরোহিত আর নিতান্ত আত্মীয় দুই একজনকে নিয়ে বিবাহ-ব্যাপাব শেষ কবে আসবেন। কিন্তু তাঁব মা এ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তিনি বলেছিলেন, তাঁব ছেলেব বয়স এমন কি হয়েছে! এ বয়সে ত অনেকে প্রথম পক্ষের বিবাহ কবে থাকে। বিশেষ, তাঁদেব অবস্থা ভাল, যথেষ্ট সম্পত্তিও আছে। এ অবস্থায় তিনি তাঁব ছেলেকে চোবেব মত লুকিয়ে গিয়ে বিবাহ কবে আসবাব ব্যবস্থায় সম্মতি দান করলেন না; সুতবাং বিবাহে বব-যাত্রীব সংখ্যা নিতান্ত কম হয় নাই।

আমার জ্যেঠামহাশয় তখন বেঁচে ছিলেন; আব শিশু অবস্থায় পিতৃহীন আমি জ্যেঠামহাশয়ের বড়ই আদুরে ছিলাম। অবশ্য, আমি তখন কোন অন্যায় আব্দাব জ্যেঠামহাশয়ের কাছে করতাম না। তা হলেও যখন যে

কথা জ্যেঠামহাশয়কে বলেছি, তিনি তা অগ্রাহ্য করেন নাই ; আমার সকল সাধই তিনি সাধ্যানুসারে পূরণ করতেন।

সেই বিবাহে জ্যেঠামহাশয় যাবেন শুনে, আমি তাঁকে ধরে বস্‌লাম, আমিও তাঁর সঙ্গে যাব। তিনি প্রথমে সম্মত হলেন না, ব'ল্‌লেন, কনের বাড়ী অনেক দূব, আমাদের গ্রাম থেকে প্রায় আট নয় ক্রোশ দূরে। যদিও রেলে যেতে হবে, তা হলেও ষ্টেসন থেকে কনের বাড়ী প্রায় দুই মাইল দূরে। এ অবস্থায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে আমার খুব কষ্ট হবে। তিনি আরও বল্‌লেন, যারা বাপের কুপুত্র, তারাই না কি বিয়ের বরযাত্রী যায়। সুতরাং আমার যাওয়া সঙ্গত হবে না ; কারণ, আমি যে বাপেব সুপুত্র—বাবা কিন্তু আমার তিন বছর বয়সের সময়ই মারা গিয়েছিলেন।

আমি তখন বালকের ব্রহ্মাস্ত্র কান্না জুড়ে দিলাম। আমার কান্না শুনে জ্যেঠাইমার আগমন হোলো। তিনি আমার বরযাত্রী যাওয়ার ইচ্ছার কথা শুনে জ্যেঠা-মহাশয়কে বললেন, "তোমার সঙ্গে যাবে, কষ্ট হবে কেন ? আর শুনেছি কন্যাপক্ষরা বড়মানুষ। তারা ষ্টেসনে বরের জন্য ত পালকী রাখবেই ; তা ছাড়া আরও

কি দু-চারখানা বেশী পালকী রাখবে না? তারই এক-খানিতে ওকে বসিয়ে দিও; তা হলে আর হাঁটতে হবে না। ছেলে-মানুষ যেতে চাচ্ছে, নিয়ে যাও!”

এর উপর আর কথা চলে না; জ্যেঠামহাশয় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে সম্মত হলেন।

যথাসময়ে সেজেগুজে বাড়ী থেকে বরের পালকিতে চড়ে আমি ষ্টেসনে গেলাম। ববেব প্রথম পক্ষের ছেলেটিও যাবার জন্য আব্দাব করেছিল; কিন্তু ছেলেকে না কি বাপের বিয়ে দেখতে নেই, সেই জন্য তার যাওয়া হোলো না। আমিই একমাত্র বালক সেই বিয়েতে বরযাত্রী গিয়েছিলাম।

যে ষ্টেসনে নেমে কনের বাড়ী যেতে হবে, সেখানে গিয়ে আমরা দেখ্‌লাম, কন্যাকর্ত্তা পাঁচ-ছয়খানি পাল্‌কি, আর আট-দশখানি গো-যান পাঠিয়েছেন। আমি একখানি পাল্‌কিতে চড়ে বস্‌লাম; পথ হেঁটে বরযাত্রী-গিরি আর আমাকে করতে হোলো না।

কন্যাকর্ত্তার বাড়ীতে মহা সমারোহ। আমাদের কোনই কষ্ট হোলো না। আহারাদিও বেশই হোলো। অনেক রাত্রিতে বিবাহের লগ্ন ছিল, সুতরাং আমি আর বিবাহ দেখ্‌তে পাই নি, তার আগেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

কনে যে কেমন, কত বড়, সে রাত্রিতে তাও আমি জান্‌তে পারি নি।

পরদিন বিকেল পাঁচটাব গাড়ীতে আমাদের ফেরবার কথা। মধ্যাহ্ন-ভোজ শেষ হোতেই প্রায় তিনটা বেজে গেল। তখন বর-কনে বিদায় করবার তাড়া পড়ে গেল, সাজসজ্জা হোতে লাগল।

সেই সময় আমি একবার কন্যাকর্ত্তার বাড়ীর মধ্যে গিয়েছিলাম, তখন জামাই-মেয়ের যাত্রা উপলক্ষে যে যে অনুষ্ঠান হয়, তা হয়ে গিয়েছে। বর-কনে তখন যাত্রা করবে।

কিন্তু, কনে কিছুতেই তার দিদির আঁচল ছাড়তে চায় না ; আর সে তখন একেবারে মরা-কান্না জুড়ে দিয়েছে। আমি চেয়ে দেখলাম, মেয়েটি আমার চাইতেও ছোট ; বোধ হয় তার বয়স এই আট নয় বৎসর হবে। এই ছোট বালিকার সঙ্গে বত্রিশ তেত্রিশ বছরের এক-ছেলের-বাপ বরের বিবাহ। আমি তখন বারো বছরের হলেও এ ব্যাপার দেখে আমার এমন একটা অশ্রদ্ধা বোধ হয়েছিল, যে তা আর বলতে পারিনে।

তার পর সেই ছোট মেয়েটা যখন কান্না আরম্ভ করল, বল্‌তে লাগল, 'দিদি গো, আমি তোদের ছেড়ে যেতে পারব না', 'মা গো, আমি যাব না', আর

কাতর নয়নে চারি দিকে চাইতে লাগল, আর তার বড় বোনের বুকের মধ্যে আশ্রয় খুঁজতে লাগল, তখন আমার সেই বালক প্রাণে যে আঘাত লেগেছিল, আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও তা ভুলতে পারি নাই। এখনও যেন আমার কাণে সেই বালিকার করুণ ক্রন্দন, হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ জেগে উঠে "মা গো, আমি যাব না!"

কে তখন তার কথা শোনে! তাকে জোর করে যখন বরের সঙ্গে এক-পাল্‌কিতে তুলে দিলে, তখনও সে ছুটে বের হতে চায়। যাদের সে চেনে না, কোন দিন দেখে নাই, যে গ্রামের নাম সে কখন শোনে নাই, যেখানে চারি দিকে চেয়ে সে কোন পরিচিত মুখ দেখতে পাবে না, নয় বছরের বালিকাকে সেই তখনকার মত নির্ব্বান্ধব স্থানে পাঠিয়ে দেওয়া হোলো। বাল্যবিবাহ ভাল, কি মন্দ, তা আমি বল্‌ছি নে; কিন্তু নয় বৎসরের মেয়ে, যে সংসারে বাপ-মা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন ছাড়া আর কাউকে দেখে নাই, তাকে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে, অপরিচিত লোকের মধ্যে যেতে হলে তার মনে যে কি আতঙ্ক উপস্থিত হয়, তার মুখে যে কি অসহায় ভাব ফুটে ওঠে, সেদিন বরযাত্রী গিয়ে তা আমি দেখ্‌তে পেয়েছিলাম, আর এখনও তার স্মৃতি আমাকে পীড়া দেয়।

# লর্ড মেয়োর অপঘাত-মৃত্যু

'সেকাল' শুনে কেহ যদি মনে করেন আমি মান্ধাতার আমল বা তারও আগের কথা বলতে যাচ্ছি, তা'হলে এখানেই আমার "কথার" পরিসমাপ্তি করতে হয়— আমি অত সেকেলে আমলের কথা বলব না,—আমার "সেকাল" এই সাতান্ন বৎসর পূর্ব্বের সময়, অর্থাৎ ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ। তখন আমার বয়স বার-তের বৎসর। আমি তখন বালক হলেও সে সময়ের একদিনের ঘটনা এখনও আমার চক্ষের সম্মুখে জ্বলজ্বল করছে, এখনও সে ঘটনার সামান্য অংশও আমি ভুলে যাই নি।

আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখনকার কলিকাতা

আব এখনকার কলিকাতায় অনেক তফাৎ। তখন সহরের মধ্যে অনেক অঞ্চলে রাত্রিতে শিয়ালের ডাক শুন্‌তে পাওয়া যেত ; তখন এত কোঠা-বালাখানা হয় নি, এত বড় বড় রাজপথও তৈরী হয় নাই। ঠিক মনে পড়ছে না, তখন জলের কল হয়েছিল কি না। কোন্ বছরে সহরে প্রথম কলেব জল এসেছিল, তা পুঁথিপত্র না দেখলে বলতে পারি না। তখন গঙ্গার ধাবে বাস্তা ছিল না ; সহরেব অনেক আবর্জ্জনা তখন যেখানে সেখানে গঙ্গায় ফেলা হোতো। ট্রাম গাড়ী বল্‌তে গেলে এই তো সেদিন চলতে আবম্ভ করেছে। তখন যান ছিল ঘোড়াব গাড়ী, আর পাল্‌কির প্রচলন ছিল। আমি যে ঘটনার কথা বলছি, তা সেই সময়েব কথা।

তারিখ বলতে পারব না, মাঘ মাস শীতের সময়। সরস্বতী পূজার সময়ের কথা। সেকালে যে কত সরস্বতী পূজা হোতো, তার সংখ্যা করা যায় না। আমাদেব বাসা তখন ছিল কুমারটুলীতে। আমাদের বাসাব অতি নিকটেই কুমারদের এক আড্ডা ছিল ; এখনও সেইখানেই আছে ; কিন্তু সেকালের তুলনায় এখন মূর্ত্তি তৈরীর শিল্পী, ডাকের সাজ প্রস্তুত-কারক একপ্রকার নেই বল্‌লেই হয়। সামান্য কয়েক ঘর লোক ব্যবসায়টী রক্ষা

করছেন। আমরা দেখেছি, সরস্বতী পূজার আট-দশ দিন আগে থেকে কুমারটুলির রাস্তায় এত জনতা হোতো, এত ক্রেতার সমাবেশ হোতো যে, পথ দিয়ে গাড়ী চলা দূরে থাক, লোকের ভিড়ে আমাদের বয়সের বালকেরা সে পথে এগুতেই পারত না। আবও শুনতাম, যাদের সঙ্গে মা সরস্বতীর কোনই সম্বন্ধ নেই, বরঞ্চ যারা বিদ্যার সেবকদিগকে বিপথে নিয়ে যেতেই তৎপর, সেই অবিদ্যারাই না কি বেশী সরস্বতী পূজা করতো। আরও একটা কথা শুনেছি এবং নিজেরাও দেখেছি যে, এই সরস্বতী পূজার যে-সব নিমন্ত্রণ-পত্র লেখা হোতো, সেগুলি এমন হেঁয়ালি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ হোতো যে, "মূর্খেতে বুঝিতে নারে পণ্ডিতে লাগে ধন্ধ"। আমরা ত তখন চারুপাঠ পড়তাম, আমরা সে সব পত্রের অর্থই করতে পারতাম না।

যাক্ সে কথা। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের এই সরস্বতী পূজার দিন প্রাতঃকালে সহরময় প্রচারিত হোলো যে, তখনকার বড়লাট লর্ড মেয়ো আন্দামান দ্বীপে সের আলি নামক একজন যাবজ্জীবন-দ্বীপান্তর-বাস-দণ্ড-প্রাপ্ত পাষণ্ডের হস্তে নিহত হয়েছেন। লাট সাহেব আন্দামান দ্বীপ দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ হয়েছে।

আমরা কত দিন থেকে আশা ক'রে ব'সে আছি—সরস্বতী পূজার উপলক্ষে কত বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাবো, কত পূজাবাড়ীতে যাত্রা, কবি, পাঁচালী, হাফ আখড়াই শুন্‌বো ; আর কি না বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ! সহরময় প্রচারিত হোলো, সব আমোদ-আহ্লাদ বন্ধ করতে হবে, গান-বাজনা কিছুই হবে না, কোন রকমে পূজা হবে, এমন কি পরদিন প্রতিমা বিসর্জ্জনের সময়ও কেহ ধুমধাম করে বাজি-বাজনা নিয়ে রাস্তায় বেরুতে পারবে না। সেটা করা যে কর্ত্তব্য নয়, তা এখন বুঝতে পারি ; কিন্তু তখন আমরা বালক,—আমাদের এত দিনের আশা ভঙ্গ হোলো ; সেই জন্য মনে ক্ষোভের সঞ্চার হোলো। তাই ত, এবারকার সরস্বতী পূজাই একেবারে মাটী। আমার অভিভাবক বড়দাদা মহাশয় ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগী হ'লেও এসব পূজা-পার্ব্বণে যোগ দিতে তাঁর আপত্তি ছিল না। তিনি আর সেদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিমা দেখতে গেলেন না, নিজেও বেরুলেন না।

তার তিনচার দিন পরেই সহরময় প্রচারিত হোলো যে, লাট বাহাদুরের মৃতদেহ কলিকাতায় আনীত হয়েছে এবং অমুক দিন বড়লাটের প্রাসাদে দরবার-কক্ষের সিংহাসনের উপর সেই শবাধার রক্ষিত হবে। বেলা

এগারটা থেকে অপরাহ্ণ চারটা পর্য্যন্ত লাটপ্রাসাদের দ্বার অবারিত—যাহাব ইচ্ছা সেই লাটপ্রাসাদের বিস্তৃত দরবার-হলে গিয়ে মৃত লাট-সাহেবের প্রতি সম্মান দেখাতে পারবে।

এই সংবাদ শুনে আমবা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠ্‌লাম। যাক, লাট সাহেবের বাড়ীতে যেতে পারব; স্বধু প্রাসাদের প্রাঙ্গণে নয়, একেবারে দরবাব-হলে প্রবেশ করতে পারব, এ কি আমাদেব মত সামান্য লোকের কম সৌভাগ্যের কথা। ভাগ্যি লাট সাহেব মারা গিয়েছিলেন, তাই লাট-প্রাসাদে সকল ধনী দরিদ্র নির্ব্বিশেষে প্রবেশাধিকার পেয়েছিল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে আমরা লাট-প্রাসাদের সিংহদ্বারে গিয়ে উপস্থিত হোলাম। দ্বার অবারিত, কালো পোষাক-পরা সান্ত্রী, সাজ্জন প্রভৃতি স্থানে স্থানে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, কাহাকেও বাধা দিচ্ছে না। পিপীলিকার সারির মত জনপ্রবাহ নীরবে সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশ করছে। লাট সাহেবের বাড়ীর প্রকাণ্ড সিঁড়ির নিচেই সকলের জুতা ছাড়তে হোলো। প্রহরীরা বল্‌ল,—দরবার-হলের অপর পার্শ্ব দিয়ে বের হলে সেখানেই সকলে নিজের নিজের জুতা পাবেন, এদিকে আর আস্‌তে হবে না। আমরা

খালি পায়েই গিয়েছিলাম, আমাদেব আর জুতা হারানো বা গোলমালের ভয় ছিল না।

সিঁড়ি দিয়ে উপরের বারান্দায় গিয়ে দেখলাম, সমস্ত বারান্দাটা কালো কাপড়ে মোড়া হয়েছে। তারপর যখন প্রকাণ্ড প্রবেশ-দ্বার অতিক্রম করে ভিতরে প্রবেশ করলাম, তখন যে দৃশ্য আমাদের নয়ন-সম্মুখে উপস্থিত হোলো, তার কথা এখনও মনে আছে। আমবা গিয়ে-ছিলাম প্রায় বেলা একটার সময়। বাহিরে তখন রৌদ্র। লাট-প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ ক'রে মনে হোলো আমরা ঘোর অমাবস্থার অন্ধকারেব মধ্যে এসে পড়েছি। সমস্ত দরবার-গৃহ কালো পর্দ্দায় আবৃত; দেওয়াল, স্তম্ভরাজি, উপরের খিলান সমস্ত কৃষ্ণবস্ত্রে আচ্ছাদিত। গ্যাসের আলো সব নিবিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার বদলে অতি অল্প কয়েকটা মোমের বাতি যেন শোকে কাতর হোয়ে মিটমিট করে জ্বল্‌ছে; আর সেই স্তিমিত আলোকে গাঢ় অন্ধকার আরও যেন গাঢ়তর বোধ হচ্ছে। দরবার-হলের মধ্যে দুই পাশে গোরা সার্জ্জনদল কালো পোযাক পরে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দেখে মনে হোলো এরা সব জীবিত নয়, এমনই নিস্পন্দভাবে সবাই দাঁড়িয়ে আছে। এই গভীর অন্ধকারে, এই অপূর্ব্বদৃষ্ট দৃশ্য

এই শোকে বিহ্বল গাম্ভীর্য্য, আর এই নীরব জনসঙ্ঘ সে সময় আমার মনে যে ভয়ের সঞ্চাব করেছিল, চারিদিকে চেয়ে আমার মনে যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছিল, এই সুদীর্ঘকালেও আমি তা ভুলতে পারিনি, আব এমন শোকের অভিব্যক্তিও আমি কখনও দেখিনি।

দরবাব-হলেব ভিতব দিয়ে আমরা অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলাম; বাতিব সংখ্যা এত কম যে, কেহ কাহাকেও চিনতে পাবছিনে। দববাব-হল ত ছোট নয়। আমবা যখন সিংহাসনেব সম্মুখে উপস্থিত হোলাম, তখন দেখলাম সিংহাসনেব উপব কালো বস্ত্রাবৃত শবাধার রক্ষিত হয়েছে। দুই পাশে বাতি-দানে বোধ হয় দশটা আলো ভয়ে ভয়ে জ্বলছে; সিংহাসনেব নীচে দুই পাশে চাব জন সাহেব চিত্রপুত্তলিকার মত স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমরা যুক্তকরে সেই শবাধাবকে অভিবাদন করে, সিংহাসনকে দক্ষিণ পার্শ্বে রেখে দরবার হলের দক্ষিণ দিকের দ্বার দিয়ে বের হয়ে এলাম। বড়লাটের প্রাসাদের মধ্যে তারপর এই এতদিনের মধ্যে কোন দিনও প্রবেশের উপলক্ষ উপস্থিত হয় নাই। লাটবাড়ীর

প্রাঙ্গণে দুই চারবার গিয়েছি বটে ; কিন্তু কোন দিনই বাড়ীর মধ্যে যাইনি। এতকাল চলে গিয়েছে, এখনও লাট-প্রাসাদের সম্মুখ দিয়ে যখনই যাই, তখনই সেই ১৮৭২ অব্দের সেই দৃশ্য আমাব মনে জেগে উঠে।

# বিজয়া উৎসব

অনেকদিন আগেকার কথা। তার পর পঞ্চান্ন বৎসর অতীত হয়ে গেছে। আমি তখন স্কুলে পড়ি। আমার সহপাঠী এক জমীদারের ছেলে ছিলেন। তাঁর আসল নাম ও বাসস্থানের নাম আর বলব না। ধরে' নিন তাঁর নাম রাধাবল্লভ সরকার; তাঁর বাপের নাম গোপীবল্লভ সরকার; তাঁদের গ্রামের নাম রহমতপুর।

রাধাবল্লভ আমাদের গ্রামের এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থেকে আমাদের স্কুলে পড়তেন। মাসে মাসে কিছু কিছু খরচ তিনি ব্রাহ্মণ-ঠাকুরকে দিতেন।

আমার সঙ্গে রাধাবল্লভের এমন বন্ধুত্ব হয়েছিল যে, তিনি অনেক সময় আমাদের বাড়ীতেই থাক্‌তেন। আমরা দরিদ্র হোলেও এই বড়মানুষ জমীদারের ছেলে আমাদের যেন পরমাত্মীয় হয়ে পড়েছিলেন। আমার মা

তাঁকে বড়ই স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তেন। আমি মায়ের একমাত্র সন্তান। মা তাই যখন-তখন বল্‌তেন, আমার ভাগ্যগুণে তিনি আর একটী ছেলেরও মা হয়েছেন।

আমাদের যা সামান্য জমিজমা ছিল, তার আয় থেকে আমাদের এই দু'টী প্রাণীর ভরণ-পোষণ নির্ব্বাহ হয়ে যেতো—সঞ্চয়ও কিছু হোতো না, অভাবও ছিল না।

রাধাবল্লভ অনেক সময় এটা-ওটা দিয়ে আমাদের কিঞ্চিৎ সাহায্য কর্‌তে চাইতেন; কিন্তু আমার মা কিছুতেই তাঁর কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য নিতে সম্মত হতেন না; তিনি বল্‌তেন, আমি আর কয়দিনই বা বাঁচব। আমার অভাবে বাবা রাধাবল্লভ, তোমাকেই আমার এই অনাথ ছেলে কেশবের ভার নিতে হবে। ওর ত আর কেউ নেই। তোমাকেই কেশব আপন ভাইয়ের মত দেখে; আমিও তোমাকে আমার ছেলে বলেই মনে করি। আমার যা আছে, তাতে কোন প্রকারে চলে যাচ্ছে। এর পরে হয় ত অভাব হবে; এখন আর কিছু আমার দরকার হবে না।

মা যদি তখন ভবিষ্যৎ দেখ্‌তে পেতেন, তা হলে অমন কথা বল্‌তে পারতেন না; রাধাবল্লভদের তখনকার

অবস্থার কথা জান্‌লেও তিনি তাঁর উপর এত নির্ভর করবার কথা মুখেও আনতেন না।

কথা এই যে, রাধাবল্লভের বাপ গোপীবল্লভ বাবু এমন ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, এই বিপুল ঋণ শোধ করা দূরে থাক, তার সুদ পর্য্যন্ত যথারীতি দিতে পারছিলেন না। যে সময়ের কথা আমি বল্‌ছি, তখন গোপীবল্লভ বাবু তাঁর জমীদারী বিক্রয় করে ঋণ শোধের ব্যবস্থা করছিলেন। জমীদারীর সামান্য একটু অংশও হয় ত রক্ষা করতে পারবেন না ; তাঁকে একেবারে পথে দাঁড়াতে হবে। সুতরাং রাধাবল্লভদের অবস্থা আমাদের অপেক্ষাও যে মলিন হবে, এ কথা আমি জান্‌তে পেরেছিলাম ; কিন্তু রাধাবল্লভের অনুরোধে কথাটা প্রকাশ করি নাই।

রহমতপুর আমাদের গ্রাম থেকে বেশী দূর নয়, এই ক্রোশ পাঁচেকের পথ। রহমতপুরের জমীদার সরকার বাবুদের নাম আমাদের অঞ্চলের সকলেই জান্‌ত। তাঁরা যে মামলা-মোকর্দ্দমা করে ঋণগ্রস্ত হয়েছেন, সে কথাও দেশের লোকের অজ্ঞাত ছিল না। তা হোলেও সকলেরই ধারণা ছিল, জমীদার গোপীবাবু সমস্ত ধার শোধ করে দিতে পারবেন ; রহমতপুরের বাবুদের প্রতিপত্তি নষ্ট হবে না। লোকে যা মনে করেছিল, তা

হওয়ারও সম্ভাবনা হয়েছিল ; কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্য রকম ; তাই একটা অঘটন ঘটে' সব গোল হয়ে গেল।

রহমতপুরে একঘর গোয়ালা সামান্য অবস্থা থেকে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চয় করেছিল। তার নাম আগে ছিল সর্ব্ব গোয়ালা ; পবে অবস্থা ভাল হওয়ায় সে হয়েছিল শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ ঘোষ। এমনই হয়ে থাকে। এই সর্ব্ব গোয়ালা প্রথমে দৈ-দুধের ব্যবসায় কবত। তাতে হাতে কিছু টাকা জমতে সে নিকটবর্ত্তী কয়েকটা গঞ্জে আড়ত খুলে চালানী কারবার আরম্ভ কবে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হোলো ; সর্ব্ব গোয়ালার কাববারে যথেষ্ট লাভ হ'তে লাগল ; সে তখন গোয়ালা ব'লে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ কর্‌তে লাগল ; তার নাম হোলো সর্ব্বানন্দ ঘোষ।

জমীদার গোপীবল্লভ সরকাব মহাশয়েব ঋণ শোধের জন্য সর্ব্বানন্দ অগ্রসর হোলো। সমস্ত জমীদারী, মায় ভদ্রাসন, পুকুর, বাগ-বাগিচা সব সর্ব্বানন্দের কাছে বেচলেও ঋণ একেবারে শোধ হয় না, সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গাছতলা আশ্রয় করতে হয়। এই ভেবে গোপীবাবু আজ-কাল করছিলেন, পাকা কথা কিছুই দেন নাই। সেই সময় ময়মনসিংহ জেলার জমীদার লাহিড়ী বাবুরা গোপীবাবুর এই বিপদের কথা শুনে তাঁর জমীদারী

কিন্‌বার প্রস্তাব করে পাঠালেন। গোপীবাবুর জমীদারীর পার্শ্বেই লাহিড়ী বাবুদের একটা বড় মহাল ছিল ; তারই জন্য তাঁদের এই জমীদারী কিনবার আগ্রহ হোয়েছিল। তাঁরা গোপীবাবুর সমস্ত ঋণ শোধ করে দিতে সম্মত হলেন এবং দুই একখানি জোতও তাঁকে দেবেন বললেন ; বসতবাড়ীও ছাড়তে হবে না। গোপীবাবু এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন ; লাহিড়ী বাবুদের এই অনুগ্রহকে তিনি ভগবানের কৃপা বলেই মনে করলেন ; কিন্তু আগেই বলেছি, একটা অঘটন ঘটে সব গোল হয়ে গেল।

গোপীবাবু লাহিড়ী বাবুদের কাছে কথা দিলেন যে, সম্মুখে পূজা। পূজার পরই বিক্রয়-পত্র লেখাপড়া হবে। লাহিড়ী বাবুরাও এই কথায় অসম্মতি প্রকাশ করলেন না ; গোপীবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে পিতৃ-পিতামহের কালাগত দুর্গোৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হলেন।

কয়েক বৎসর থেকে দুর্গোৎসবের সময় আমি রাধাবল্লভের সঙ্গে তাঁদের বাড়ীতে পূজার কয়দিন মহা আনন্দে কাটিয়ে আসতাম। যে বৎসরের কথা বলছি, সে-বারও রাধাবল্লভের সঙ্গে রহমতপুরে গিয়েছিলাম।

এদিকে সর্ব্বানন্দ ঘোষ যখন শুনতে পেলে যে, গোপীবাবু তাঁর জমীদারী তার কাছে বিক্রয় না

কবে লাহিড়ীবাবুদেব সঙ্গে কথাবার্ত্তা ঠিক কবেছেন এবং পূজার পরেই লেখাপড়া হবে, তখন তার ভয়ানক রাগ হোলো। টাকাব গবম সকলে সহ্য করতে পারে না, সর্ব্বানন্দও পাবল না। যে সর্ব্বানন্দ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গোপীবাবুর বাড়ীতেই দুধ-ঘি জোগান দিত, যার পিতা-পিতামহ সবকারবাবুদেব অনুগত ভৃত্য ছিল, টাকাব মানুষ হ'য়ে সর্ব্বানন্দ সে সব কথা ভূলে গেল। তাব পব গ্রামের জমীদার হবাব যে আশা সে পোষণ করেছিল, তাও হোলো না। এতে সর্ব্বানন্দ একেবাবে ক্ষেপে উঠল। সে তখন দুর্গোৎসব কববার আয়োজন কবল। সব রকমে জমীদাব-বাড়ীর পূজাকে হাবিয়ে দেবার জন্য সে একেবারে বদ্ধ-পরিকর হোলো। গ্রামে ধূম লেগে গেল। কথাটা শুনে গোপীবাবু একটু হেসে বলেছিলেন, বেশ ত! মায়ের পূজা করা সর্ব্বানন্দের পক্ষে যোগ্য কাজই হয়েছে।

রহমতপুব ও নিকটবর্ত্তী পাঁচ সাতখানি গ্রামের প্রতিমা বিসর্জ্জনের স্থান ছিল রহমতপুরের পার্শ্ববর্ত্তী ধনেখালির বিলে। এই বিলে যেতে হলে রহমতপুরের রথতলা দিয়ে যেতে হয়। বহুকাল থেকে এই প্রথা চলে আসছিল যে, ঐ অঞ্চলের যে সকল গ্রামের প্রতিমা ধনেখালির বিলে বিসর্জ্জন দেওয়া হোতো, সে সকল

প্রতিমা এসে রথতলায় জমা হোতো এবং সেখানে সেই উপলক্ষে একটা মেলা বস্‌ত। তারপর প্রথা ছিল যে, রথতলা থেকে সকলের আগে জমীদার সরকার-বাড়ীর প্রতিমা বিলের দিকে যাবে, তারপর অন্যান্য প্রতিমার শোভাযাত্রা হবে। সরকার-বাড়ীর প্রতিমা আস্‌তে বিলম্ব হোলে অন্য সকলকে তার আগমনের প্রতীক্ষা করতে' হোতো। এটা জমীদারের সম্মান ; এবং ঐ সম্মান তাঁরা স্মরণাতীত কাল থেকে ভোগ ক'রে আসছেন। পূজার তুইদিন নির্ব্বিঘ্নে কেটে গেল। নবমী পূজার দিন রহমতপুর ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে প্রচারিত হোলো যে, সর্ব্বানন্দ ঘোষ এই চিরাগত প্রথার অন্যথাচরণ করবে ; তার প্রতিমা সর্ব্বাগ্রে রথতলা থেকে বিলের দিকে যাবে। তার এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করবার জন্য সে যথেষ্ট আয়োজন করেছে, লোক জন লাঠিয়াল সংগ্রহ করেছে। সে বুঝতে পেরেছিল, এ ব্যাপার নিয়ে একটা গোল-যোগ হয় তো হ'তে পারে। তবে গোপীবাবুর যে রকম অবস্থা, তাতে তিনি যে কোন রকম বিরুদ্ধাচরণ করতে পারবেন, সে বিষয়ে সর্ব্বানন্দের সন্দেহ ছিল। তবুও ভবিষ্যৎ ভেবে সে কিছু লোক-জন, লাঠিয়াল বাড়ীতে এনে রেখেছিল।

এই সংবাদ যখন গোপী বাবুর কর্ণগোচর হোলো, তখন তিনি একেবারে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন—কি, সর্ব্বা গোয়ালার এত বড় স্পর্দ্ধা! সে সরকার-বাড়ীর প্রতিমার আগে তাব প্রতিমা বিসর্জ্জন দেবে। এখনও গোপী সরকার বেঁচে আছে। এখনও তার শবীরে বঘুবাম সরকাবের রক্ত প্রবাহিত হচ্চে। ডুবেছি ত ডুবব-ই। দেখে নেব, কে কা'ল আমাব প্রতিমাব আগে প্রতিমা নিয়ে যায়। সবই তো গিয়েছে, এইবাব শেষ খেলা! এ খেলায় রহমতপুবেব গোপী সবকার পিছোবে না। সরকারদের নাম সে কিছুতেই কলঙ্কিত কববে না। তার জন্য জীবন পণ।

কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হ'য়ে গেল। গোপী সরকারেব মান রক্ষাব জন্য, রহমতপুবেব জমীদাবদেব প্রতিষ্ঠা অব্যাহত রাখবার জন্য দশ-বারো-খানা গ্রামের লোক একেবারে ক্ষেপে উঠল!

সর্ব্বানন্দ এ সংবাদ পেয়েও দমলো না। তার যে টাকার গবম! সে হুকুম দিল, যে সর্দ্দার যত টাকা চাইবে, তাই দেব, আমার প্রতিমাকে আগে নিয়ে যেতেই হবে। নবমীর রাত্রিতেই দূব গ্রাম থেকে আরও লাঠিয়াল সংগ্রহ করা হোলো, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির

লাঠিয়াল ও সর্দ্দারেরা সরকার-বাড়ীর নিমকের অপমান করতে সম্মত হোলো না। তারা সবাই এক-জোট হ'য়ে প্রতিজ্ঞা করল, জমীদারের মান বাঁচাবার জন্য তারা প্রাণ দেবে!

পরদিন বিজয়ার বাজনা বেজে উঠল। সর্ব্বানন্দের বাড়ীতে লাঠিয়াল সব সেজে দাঁড়াল। এদিকে জমীদার-বাড়ীতেও দলে দলে শিক্ষিত লাঠিয়াল আর সর্দ্দার এসে জুট্‌ল। গোপীবাবু আমাকে আর রাধাবল্লভকে ডেকে বল্‌লেন, "তোমরা আজ ভাসান দেখতে যেও না। কি হবে, তা বলা যায় না। আজ হয় ত মানুষের রক্তে মায়ের প্রতিমাকে স্নান করাতে হবে; হয় ত সেই রক্তের ধারার মধ্যেই রথতলাতেই মায়ের বিজয়া হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে সরকার-বাড়ীরও অস্তিত্ব লোপ হবে। আমাকে এবার মায়ের প্রতিমার আগে আগে যেতে হবে। আজ দেখিয়ে দেব, গোপী সরকার বৃদ্ধ হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও লাঠি হাতে ক'রে দাঁড়ালে পঞ্চাশ জন লাঠিয়ালের মহড়া নিতে পারে। তোমরা যেও না বাবা আজ!"

তাঁর কাছে স্বীকার করলেও আমরা এই শোভাযাত্রায় না গিয়ে পারলাম না; বাপের বেটা রাধাবল্লভও মাল-কোঁচা কাপড় পরে লাঠি হাতে ক'রে শোভাযাত্রার পিছনে

পিছনে চল্‌ল। আমাকে শুধু বল্‌ল, "কেশব, একটা কাজ কোবো ভাই! বাবাকে যদি বিপন্ন দেখি, তা হ'লে আমি তাঁর সাহায্যেব জন্য এগিয়ে যাব! তুমি তখন আমাব সঙ্গে যেও না. খববদাব! আজ মবণ-বাঁচনেব খেলা!"

সবকাব-বাড়ীব প্রতিমা যখন বথতলায় পৌছিল, তখনও সর্ব্ব গোয়ালাব প্রতিমাব দেখা নাই। একটু পবেই বহু লোকজন বেষ্টিত হযে গোয়ালাব প্রতিমা বথ-তলাব দিকে অগ্রসব হ'তে লাগ্‌ল। গোপীবাবু পূর্ব্বেই সকলকে সাবধান কবে দিয়েছিলেন যে, সর্ব্ব গোয়ালাব প্রতিমা যদি প্রচলিত প্রথা-মত পিছনে থাকে, তা হ'লে কেহ যেন কোন গোলমাল না কবে, আব সে যদি সরকার-বাড়ীব প্রতিমাকে অতিক্রম করতে চেষ্টা কবে, তা হ'লে প্রাণপণে বাধা দিতে হবে। সকলে সমস্বরে বলে উঠল "জান কবুল!"

রথতলায় তখন প্রায় পঁচিশখানি প্রতিমা উপস্থিত হয়েছে; সরকার-বাড়ীব প্রতিমা সকলেব অগ্রভাগে রয়েছে। অন্য সব প্রতিমা এসে পৌছিলেই শোভাযাত্রা আরম্ভ হবে।

সর্ব্ব গোয়ালার প্রতিমা বথতলায় এসে সকলের পিছনে একবার দাঁড়ালো। সকলেই মনে কর্‌ল, তা হলে

ঐ প্রতিমা আর অগ্রসর হচ্চে না। অকস্মাৎ কে এক জন হুকুম দিল—এগোও !

তখন বীর-বিক্রমে সর্ব্ব গোয়ালার প্রতিমা নিয়ে লাঠিয়ালরা অগ্রসর হোলো ! তখন আর কি ! জনতার ভিতর থেকে "দীন দীন, জয় জয়" রবে একদল লাঠিয়াল প্রতিমার অগ্রগতি বাধা দেবাব জন্য এগিয়ে গেল। তাদের দলের সকলের আগে যষ্টিধাবী গোপী সবকার !

দুই দলে তুমুল দাঙ্গা আরম্ভ হোলো ! সে এক ভীষণ ব্যাপার ! এখনও সে কথা মনে আছে। জীবনে এমন দৃশ্য কখনও দেখি নাই। শুধু লাঠির খেলা, আর বিকট চীৎকাব ! প্রতিমা সব চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেল। কত লোকের যে মাথা ফাটলো, তাব সংখ্যা নাই। গোপী বাবু যখন অবসন্ন হ'য়ে মাটীতে পড়ে গেলেন, তখন দূব থেকে দেখলাম রাধাবল্লভ পিতার মূর্চ্ছিত দেহের সম্মুখে দৌড়িয়া সদর্পে আততায়ীদিগকে আহ্বান করছে। বালক অভিমন্যুর সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখে বিপক্ষ দল কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল ; তারা তখন রণে ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন করল।

তখন সূর্য্য ডোবে-ডোবে। আর কার বিজয়া হবে ! সব মূর্ত্তি চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। সকলে ধরাধরি ক'রে গোপী

বাবুর সংজ্ঞাহীন দেহ বাড়ীতে নিয়ে এল। তাঁব আর জ্ঞান সঞ্চার হোলো না। সেই রাত্রিতেই সবকার-বাড়ীর সম্মান অক্ষুন্ন বেখে রহমতপুবেব জমীদার গোপী-মোহন সরকাব সাধনোচিত ধামে চলে গেলেন। মায়েব বিজয়া হোলো না—মায়েব ভক্ত সন্তান বিজয়-তিলক-চৰ্চ্চিত হ'য়ে মায়েব কোলে চ'লে গেলেন!

# ভাতার-মারীর মাঠ

অনেকদিন আগেব একটা কাহিনী আজ নিবেদন কব্‌ব। 'অনেকদিন আগে' কথাটা শুনে কেহ যদি মনে ক'বে বসেন যে, আমি প্রাগৈ তহাসিক যুগেব কথা বল্‌ছি, অথবা পৌবাণিক কাহিনী বল্‌ছি, অথবা ঐতিহাসিকেবা যদি ভেবে থাকেন যে মোগল-পাঠান বা কোম্পানী-বাহাদুবেব ভাবতেব বাজতক্ত অধিকাবেব সম-সাময়িক কোন ঘটনাব উল্লেখ কবছি, তা হ'লে তাদেব নিবাশ হ'তে হ'বে। আমাব 'অনেকদিন আগেব' সীমানা এই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসব; এবং এ কথাও আগে থাক্‌তে ব'লে বাখছি যে, আমি যে ঘটনাব কথা বল্‌ব, তাব যাথার্থ্য

প্রমাণ করবার জন্য আমি তাম্রশাসনও দেখাতে পারব না, ভিন্‌সেণ্ট স্মিথকেও তলব করতে পারব না, বা আমার সোদরোপম স্নেহভাজন ঐতিহাসিক শ্রীমান্ ব্রজেন্দ্রনাথের অনুগ্রহে রেকর্ড-অফিসের পুবাতন কাগজপত্রও নজির স্বরূপ হাজির করতে পারব না ;—আমার বর্ণিত কাহিনী একেবারে শোনা কথা ; আর সে কথা শুনেছিলাম আমার পালকী-বাহক নিরক্ষর পোদ-পুঙ্গবদের কাছে ! আর এ কথাও আমি বলে রাখছি যে, আমি সেই পল্লীবাসী অশিক্ষিত পোদদেব কথা বিশ্বাস না ক'বে থাক্‌তে পাবি নি এবং এতকাল পরে, যখন জীবনের অনেক কথা একে-বারে ভুলে গিয়েছি—কত বন্ধুবান্ধবের কত স্নেহ, কত অনুগ্রহের কথা, কত বিপদ-আপদের কথা ভুলে গিয়েছি, তখনও সেই 'ভাতার-মাবীর মাঠে'র কাহিনী আমাব মনে আছে ;—শুধু মনে আছে নয়—হৃদয়ে মুদ্রিত হয়ে আছে। সেই কাহিনীই এতদিন পবে বল্‌তে বসেছি। অতএব আর ভূমিকা না বাড়িয়ে কথাটাই ব ল ।

তখন আমি একটা সামান্য পাড়াগাঁয়ে মাষ্টারি করতাম। তাতে সুখ যথেষ্টই ছিল—যা কষ্ট ছিল অন্ন-বস্ত্রের। মাইনে পেতাম একত্রিশ টাকা পনর আনা—পুরা বত্রিশ টাকার এক আনা পয়সা রসিদ-ষ্ট্যাম্পের

জন্য সেলামী দিতে হোতো ; সৌভাগ্যের কথা এই ছিল যে, আটাশ টাকা পেয়ে বত্রিশ টাকার রসিদ লিখে দিতে হোতো না। আর একটা কথাও ব'লে ফেলি ; মাইনে কিন্তু মাসে মাসে পেতাম না—কিস্তিবন্দী করেও না। জমীদারের স্কুল ; তিন চার মাস পরে কর্ত্তাদের তহবিলের অবস্থা যখন একটু সচ্ছল হোতো, তখনই তাঁদের অনুগ্রহ-দৃষ্টি পড়ত এই গরীব অসহায় স্কুল-মাষ্টারদের উপর। এ অবস্থায় আর-আর মাষ্টারেরা এই হতভাগ্য বাঙ্গালা দেশে যা ক'রে থাকেন, আমাকেও সেই উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়েছিল—অর্থাৎ প্রাইভেট টুইসনি করতে হোতো। তাইতে যা পাওয়া যেত, তাই দিয়ে, আর গ্রামের সদাশয় মুদিপ্রবর হরেকৃষ্ণ মাইতির দোকানের প্রসাদে কোন রকমে দিনান্নের ব্যবস্থা করা যেত। কথাটা অতি-রঞ্জন বলে কেউ মনে করবেন না ;—বাঙ্গলা দেশের গ্রাম ও পল্লীর সাড়ে পনর-আনা শিক্ষকদেরই এই অবস্থা—ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেও এই অবস্থা ছিল, এখনও তাই আছে ; আর যদি কখন স্বরাজ লাভ হয়, তখনও ঐ অবস্থাই থাক্‌বে।

থাক্ সে দুঃখ-কষ্টের কথা এখন। বলেছি তো, আমাকেও বাধ্য হ'য়ে প্রাইভেট টুইসনি করতে হোতো।

আমি দুইটী ছেলেকে পড়াতাম। তারা রবিবার বাদে প্রতিদিন প্রাতঃকালে আমার বাসায় এসে পড়ে যেত। দুইটী ছেলেই একই শ্রেণীতে পড়ত, সুতরাং একসঙ্গে দুই জনের পড়া ব'লে দিলেই চলত। একটী ছেলে তার এক আত্মীয়ের বাড়ীতে থাকৃত, অপবটী স্কুলের বোর্ডিংয়ে বাস করত। পূর্ব্বোক্ত ছেলেটী মাষ্টার মশাইয়ের দক্ষিণা দিত দেড় মণ চাউল—ধান নয় ভাই, চাউল। তার বাপ তিন ক্রোশ দূরের এক গ্রামেব সম্পন্ন কৃষি-গৃহস্থ; নগদ টাকার বদলে চাউল দিতে তাব গায়ে বাধত না। দ্বিতীয় ছেলেটীর বাড়ী প্রায় সাত ক্রোশ দূবে। তাব বাপ বড় জমীদার, সুতরাং টাকাব মানুষ। তিনি মাসে মাসে যথাসময়ে দশটী ক'বে টাকা পাঠিয়ে দিতেন। এ টাকা কখনও বাকী পড়ত না। মাসেব প্রথমে ছেলের খরচ যখন পাঠাতেন, তখন আমার টাকাটাও পাঠাতেন; এবং যে টাকা দিতে আসত, তার সঙ্গে ছেলের বাপ তারকবাবু ছেলের জন্য এবং সেই সঙ্গে মাষ্টার-মশায়ের জন্যও কখনও এক কলসী গুড়, কখনও বা একটা বড় মাছ, কখনও বা দু-সের ঘি পাঠিয়ে দিতেন; এবং কোন কার্য্য-উপলক্ষে তিনি যখন জেলায় যেতেন, তখন এই পথ দিয়ে যাবার সময় এক-আধ বেলা আমার মত গরীবের

প্রবাস-গৃহে আতিথ্যও স্বীকার করতেন। তাই, তারকবাবু ও তাঁর ছেলে আমার ঘরে-বাহিরের ছাত্র লক্ষ্মীকান্তের সঙ্গে আমার বেশ একটা আত্মীয়তা হয়েছিল।

এই আত্মীয়তার ফল-স্বরূপ এক দিন তারকবাবু তাঁর ছোট ভাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন,—উদ্দেশ্য, তাঁর বাড়ীতে একবার আমাকে পদধূলি দিতে হবে; উপলক্ষ তারকবাবুর নবজাত পুত্রের অন্নপ্রাশন। দিনও স্থির করেছিলেন ভাল—এক রবিবার। তারকবাবু অনুরোধ ক'রে পাঠিয়েছিলেন যে, শনিবার মধ্যাহ্নে একটু সকাল সকাল স্কুল থেকে বেরিয়ে তাঁর বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করতে হ'বে;—ছয়-সাত ক্রোশ পথ, তিন চার ঘণ্টাতেই অতিক্রম করা যাবে। রবিবার সেখানে থাক্‌তে হ'বে; সোমবার খুব ভোরে বেরিয়ে এসে যথা-সময়ে স্কুলে হাজিরা দেওয়া যাবে। লক্ষ্মীকান্ত দিন-দুই আগেই বাড়ী যাবে। শনিবার প্রাতঃকালে পালকী বেহারা আমার বাসায় এসে হাজির হ'বে। বলা বাহুল্য, এমন মক্কেলের সাগ্রহ নিমন্ত্রণ আমি অস্বীকার করতে পারি নি,—সম্মতি দিয়েছিলাম।

শনিবার এসে পড়ল। সেটা বৈশাখ মাস; রোদ একেবারে ঝাঁঝাঁ করে; দুপুর বেলা ঘরের বা'র হওয়া যায়

না। আমাদের স্কুল তখন প্রাতঃকালে বসে,—নয়টার মধ্যেই ছুটী হয়ে যায়, নইলে যে সব ছেলে দূর গ্রাম থেকে পড়তে আসে, তাদের কষ্ট হয়।

আমি জানতাম নটা-দশটার মধ্যেই পালকী ও বেহারা এসে পড়বে; কি জানি আমার বাসায় আসতে যদি একটু বিলম্ব হয়, তা হোলে লোকগুলো এলে তাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করবার কথা বাসায় ব'লে গিয়েছিলাম।

আমি স্কুল থেকে যখন বাসায় এলাম, তখন দেখি বেহারারা পৌঁছে গেছে। আমি আসতেই তারা নমস্কার করে বল্‌ল যে, তাদের বাবু বলে দিয়েছেন, সকাল-সকালই যাত্রা করতে। 'কাল-বোশেখী'র দিন, বেলা পড়তেই জল-ঝড় হ'বার সম্ভাবনা।

আমি বল্‌লাম, যে রোদ উঠবে, তার মধ্যে তোমরা পালকী কাঁধে করে যাবে কেমন ক'রে? তার বদলে এক কাজ করা যাক্, সন্ধ্যার পর ঠাণ্ডা পড়লে যাওয়া যাবে।

বেহারাদের মধ্যে যে প্রধান, সে বল্‌ল, না, বাবু তা হবে না; বাবুর হুকুম কি অমান্যি করতে পারি! রোদ দেখে আমরা ডরাইনে। রাস্তার মধ্যে ঝড়-তুফানেরই ভয়। আপনি স্নান-আহার করে নিন—এই এগারটা-

বারোটার মধ্যে বেরুলে আপনার আশীর্ব্বাদে এ সাত কোশ পথ তিনটের মধ্যেই পাড়ি জমিয়ে দেব।

আমি বল্‌লাম—সে না হয় হ'বে। তোমরা যে চুপ ক'রে বসে আছ ; খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে।

তারা বল্‌ল—মা-ঠাকরুণ তো রান্না করবার কথাই বলেছিলেন ; আমরা ও হাঙ্গামায় নারাজ। বাবু একটা টাকা দিয়েছিলেন, তাই দিয়ে চিড়ে ফলার করব ঠিক করেছিলাম। মা-ঠাকরুণ সে টাকাটা কেড়ে নিয়ে তাঁর চাকরকে কি ব'লে বাজারে পাঠিয়েছেন, আর আমাদের চুপ ক'রে বসে' থাকবাব হুকুম দিয়েছেন ;—আমরা বসে' আছি।

এখানে 'মা-ঠাকরুণ' কথাটার ব্যাখ্যা করতে হচ্চে। যাঁকে বেহারারা মা-ঠাকরুণ ব'লে অভিহিত করেছিল, তিনি আমার স্বর্গগতা পূজনীয়া দিদি—আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী ; বেহারাদের 'মা-ঠাকরুণে'র আমার গৃহে আগমনের সুদূর সম্ভাবনাও আমার মনে তখন উদিত হয় নাই। হায় রে সে সময় !

যাক্ সে কথা ; বুঝলাম যে দিদি বেহারাদের আহারের জন্য চিড়া-মুড়কি সংগ্রহের জন্য বাজারে লোক পাঠিয়েছেন।

বেহাবাবা এগাবটাব মধ্যেই খেযে-দেয়ে প্রস্তুত হোলো, আব আমাকে ঘন ঘন তাগিদ দিতে লাগল ; তাদেব ঐ এক কথা—বোদে কি কববে, ভয় কাল-বোশেখীব ! কাল-বৈশাখীব ভয় আমাব ছিল না ,—তাব পূৰ্ব্বে অনেক কাল-বৈশাখী আমাব মাথাব উপব দিয়ে চলে গিযেছিল , ভীষণ পদ্মা-বক্ষে কাল-বৈশেখীব ঝড়ে নৌকা ডুবে আমাকে মারতে পাবে নি, হিমালয়েব মধ্যে কত কাল-বৈশেখীব ঝঞ্ঝাবাত আমাকে চূর্ণ কবে ফেলতে পাবে নি—কত কাল-বৈশেখীব আক্রমণ সহ্য কবে এই সত্তব বছব পর্য্যন্ত বেঁচে আছি ! সে কথা থাকুক ।

বেহাবাদেব তাডনায বাবোটাব সমযই যাত্রা কবতে হোলো। আমাব বিপুল দেহেব কথা ভেবে বন্ধুবব তাবক-বাবু আটটী বেহাবা পাঠিযেছিলেন—বাববাব কাঁধ বদল কবতে হবে যে !

প্রথম ক্রোশ দেড়েকেব মধ্যে পথেব পাশে গ্রামও ছিল, মাঠও ছিল, গাছপালাও ছিল, ছায়াও ছিল। কাঁচা বাস্তা ; বর্ষাকালে অনেক স্থান ডুবে যায় ; যেটুকু মধ্যে মধ্যে জেগে থাকে, সেখানেও এক হাঁটু-ভব কাদা। আমি যেদিন যাত্রা করেছিলেম, সে দিন পথের মাঝে মাঝে কাদা ছিল, কিন্তু জলে ডুবে যায় নি ।

দেড় ক্রোশ, কি তার একটু বেশী অতিক্রম করবার পর এমন একটা মাঠে গিয়ে পড়লাম, যাকে মাঠ বল্‌লে 'মাঠে'র মর্য্যাদা বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়,—সে মাঠ নয়—একটা প্রান্তর। এমন বিশাল প্রান্তর, আমি তো অনেক স্থান ঘুরেছি, আর কোথাও দেখেছি ব'লে মনে হয় না। পিছনের দিক্ ছাড়া সম্মুখে, বাঁয়ে, ডাইনে, যে দিকে চাই, সেই দিকই যেন ধূ-ধূ করছে ; দূরে—অতি দূরে দৃষ্টিরেখাব সীমান্তে কালো মত কি যেন লি-লি করছে ; সে গ্রাম কি মরীচিকা, তাও ঠাহর করা যায় না। আমার মনে হোলো এই প্রান্তরের পরিমাণ-ফল অন্ততঃ দশ বর্গ মাইল। আর এই প্রান্তর একেবারে শূন্য। এ-দেশের জমীতে একটী মাত্র দ্রব্যের চাষ হয়—সে ধান। ধান কাটা হয়ে গেলেই শূন্য মাঠ হা, হা করতে থাকে ; পর বৎসর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে আবার ধানের চায আরম্ভ হয়। তাই তখন মাঠের শোভা অতি ভয়ানক। আমি পাল্‌কীর মধ্য থেকে সভয়ে চেয়ে দেখলাম, এত বড় প্রান্তরের মধ্যে একটা, বড় গাছ নেই, যার তলায় একটু আশ্রয় পাওয়া যেতে পারে। একে এই জনমানবহীন প্রান্তর, তাতে বৈশাখের মধ্যাহ্নের অনলবর্ষী সূর্য্যকিরণ—আমি পাল্‌কীর মধ্যে বসে' মধ্যাহ্নের এই ভীষণ মূর্ত্তি দেখে একবারে স্তম্ভিত

হয়ে গেলাম ;—প্রকৃতির এই দৃশ্য আমার কাছে একবারে নূতন—একেবাবে অপূর্ব্ব-দৃষ্ট ! কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এই প্রখর রৌদ্রের তাপে কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না ক'বে বেহারাবা তাদের সেই শব্দ-মাত্রে পর্য্যবসিত হুঙ্কার করতে করতে একই ভাবে চল্‌ছে—মাঝে মাঝে কেবল কাঁধ বদলাবাব জন্য এক একবার থাম্‌ছে। আমি এদেব এই কষ্ট-সহিষ্ণুতা দেখে অবাক্ হোয়ে গেলাম।

এই ভাবে বোধ হয় মাইল দুই-তিন গিয়ে তাবা পথের পাশে একটা জায়গায় পাল্‌কী নামালে। আমি রোদের জ্বালায় কিছুক্ষণ আগে থেকে চোক বুঁজে ছিলাম। হঠাৎ পাল্‌কী ভূমি স্পর্শ কবায় আমি দেখ্‌লাম একটা বটগাছের ছায়ায় পাল্‌কী নেমেছে। তাব পবেই দেখি বেহাবারা সেই বটগাছেব গোড়ায় গিয়ে নত-মস্তকে প্রণাম করল। আমি আর তখন পাল্‌কীর মধ্যে ব'সে থাকৃতে পারলাম না ; পাল্‌কী থেকে নেমে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি বটগাছের গোড়ায় ছোট একখানি কুটীর—আর তার মধ্যে কয়েকটী জলের জালা ও কলসী। এক জন লোকও সেখানে ব'সে আছে। বুঝতে পারলাম যে, কোন সদাশয় মহাত্মা এই প্রান্তরের মধ্যে, এই একটী-মাত্র বটগাছের ছায়ায় পথিকদের তৃষ্ণা দূর করবার জন্য

জলছত্র খুলেছেন। বিশেষ বিবরণ জানবার জন্য সেই কুটীরের সম্মুখে যেতেই আমার বেহারাদের একজন বল্‌ল, বাবু, জল খাবেন কি ?

আমি বল্‌লাম—জল পরে খাব ; আগে শুন্‌তে চাই, কে এই জলছত্র দিয়েছেন।

বেহারা বল্‌ল—সে অনেক কথা বাবু। আপনি এই ছায়ায় বসুন, আমি বল্‌ছি।

তার কথামত সেই বটগাছের ছায়ায় বসে সত্যসত্যই আমার শরীব যেন জুড়িয়ে গেল। যে বাতাস বইছিল, তা আগুন-মাখা হ'লেও আমার কাছে স্নিগ্ধ বোধ হ'ল। তখন সেই বেহারা যা বলেছিল, এত দিন পরে তার ভাষায় ঠিক ঠিক সে কাহিনী আমি বল্‌তে পারব' না ; কিন্তু সে যে ইতিহাস বলেছিল, তার একটী বিবরণও আমি ভুলি নি। সে বলেছিল—

বাবু, এই যে মাঠ দেখ্‌ছেন, এর নাম আগে ছিল বিশ হাজারী মাঠ। এর মধ্যে বিশ হাজার বিঘে জমী আছে না কি। এখন এই মাঠের নাম হয়েছে 'ভাতার-মারীর মাঠ।' এ নামও শুনেছি এই পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে দেওয়া ; আমরা তখন জন্মাইনি। এই যে বটগাছটী দেখ্‌ছেন, এরও বয়স ঐ পঞ্চাশ-ষাট বছর।

তার পর সে যে কাহিনী বল্‌ল, তা আমি আমার ভাষাতেই বল্‌ছি। এই স্থান থেকে মাইল তিনেক দূরে একটা গ্রাম আছে; তার নাম এলাইপুর। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে এই এলাইপুরে মহেশ দাস নামে এক জন মাহিষ্য চাষী বাস করত। এখন যেখানে বটগাছ জন্মেছে, সেই জমী ঐ মহেশ দাসেরই ছিল। সে নিজেই ঐ জমী চাষ করতো। জমীর পবিমাণও বেশী নয়—এই দুই বিঘে কি আড়াই বিঘে। এই জমীটুকু চাষ করবার জন্য মহেশ অন্য জন-মজুরের সাহায্য নিত না, কারণ তাদের পারিশ্রমিক দেওয়ার সামর্থ্য মহেশের ছিল না। দূরবর্ত্তী গ্রামগুলির কাছে যে সব জমী ছিল, কৃষকেরা সে-সকল জমী যখন-তখনই চাষ করত; কিন্তু এই প্রকাণ্ড প্রান্তরের মাঝখানে যে সমস্ত জমী, সে-গুলি চাষ করবার জন্য চাষীরা খুব ভোরে জমীর উপর আসত; বেলা আটটা-নয়টা পর্য্যন্ত চাষ করত; তার পরই বাড়ী চলে যেত; কারণ মাঠের মাঝে না আছে ছায়া, না পাওয়া যায় জল; দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে কি এ হেন স্থানে চাষ করা যায়?

একদিন মহেশের কি দুর্ব্বুদ্ধি হোলো। সে তার স্ত্রীকে প্রাতঃকালে বলল যে, সে তার লাঙ্গল ও দুইটা গরু নিয়ে

মাঠের মাঝের জমী চাষ করতে যাবে। দুপুর বেলা সে আর ঘ'রে আসবে না। সারাদিনই মাঠে থেকে সবটা জমী চাষ করে সন্ধ্যার সময় সে ঘরে ফিরবে,—রোজ রোজ এই দুকোশ পথ যাওয়া-আসা সে করতে পারবে না। তার স্ত্রী সে কথার প্রতিবাদ ক'রে বলেছিল, এই রোদের মধ্যে সারাদিন সেই মাঠের মাঝে থাকা ঠিক হবে না; সেখানে না আছে ছায়া, না পাওয়া যায় জল। তারও কষ্ট হবে, বলদ দুটাও মারা যাবে।

মহেশ সে কথা কাণেও তুলল না, সে বলল,—দেখ, তুমি এক কাজ কোরো। দুপুর-বেলার আগেই আমার জন্য কিছু চিড়ে মুড়ি আর এক কলসী জল নিয়ে মাঠে যেও। আমি তাই খাব, আর বলদ দুটোকেও জল খাওয়াব। তার স্ত্রী বলেছিল, এতটা পথ এখন যাবে, ঘটিখানেক জল সঙ্গে নিয়ে যাও। যদি সকাল-সকাল আসতে পার, তা হলেই ভাল হয়। এক প্রহর বেলার পরও যদি তোমাকে ফিরে আসতে না দেখি, তা হ'লে তোমার খাবার, আর এক কলসী জল নিয়ে আমি মাঠে যাব।

মহেশ এই ব্যবস্থা ঠিক ক'রে লাঙ্গল গরু নিয়ে মাঠে চলে গে'ল; তার স্ত্রী হরিমতি গৃহকার্য্যে মন দিল।

হরিমতি ভেবেছিল, তার স্বামী এই নটা-দশটার মধ্যেই ঠিক ফিরে আসবে—তুপুর রৌদ্রে কার সাধ্য যে ঐ তেপান্তর মাঠের মাঝখানে থাকে। কিন্তু সে ভুল বুঝেছিল।

বেলা যখন বেড়ে গেল, হরিমতি তখনও একবার ঘরে যাচ্ছে, একবাব বাইরে এসে পথেব দিকে চাইছে। এমনি করতে করতে বেলা যখন তুপুরের কাছে গেল, তখন হরিমতি আর অপেক্ষা করতে পারল না; সে কিছু মুড়কি আর বাতাসা আঁচলে বেঁধে, আর একটা মেটে কলসী ভ'রে জল নিয়ে সেই মাঠেব দিকে যেতে লাগল।

কম পথ তো যেতে হবে না; আব এই প্রচণ্ড রোদের মধ্যে। হরিমতি জলের কলসীটা একবার কক্ষে নেয়, আবার আঁচল দিয়ে বিড়ে পাকিয়ে মাথায় দিয়ে তার উপর কলসীটা বসিয়ে জমির আ'ল ধরে' যেতে লাগল।

এদিকে মহেশ বেলা দশটা পর্য্যন্ত চাষের কাজেই নিযুক্ত ছিল। দশটার পরে যখন রোদ বেড়ে উঠ্‌ল, তখন সে একবার মনে করল, বাড়ী ফিরে যায়; আবার ঠিক করল, আর একটু কাজ করলেই সবটা জমী চাষ করা হয়ে যায়—এই তো আর একটু পরেই হরিমতি খাবার ও জল নিয়ে আসবে, তখন না হয় তুজনে এক সঙ্গেই বাড়ী ফেরা যাবে।

ঘণ্টাখানেক যেতেই জল-তৃষ্ণায় মহেশের গলা কাঠ হ'য়ে গেল। সেই বেলা সাতটা থেকে এই বৈশাখ মাসের প্রখর রৌদ্রের মধ্যে সে কাজ করেছে—তৃষ্ণার আর অপরাধ কি ? সে তখন আর লাঙ্গল চালাতে পারল না। নিকটে গাছপালাও নেই যে, তার ছায়ায় বসে। মহেশ অধীর ভাবে পথের দিকে চাইতে লাগ্‌ল ;—তার শরীর অবসন্ন হ'য়ে পড়ল ; চোক বুজে আসতে লাগল ; সেই জনহীন প্রান্তরের মধ্যে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় সে পথের দিকে চেয়ে রইল ; এমন শক্তি তার নেই যে, তিন-চার মাইল পথ হেঁটে তখন বাড়ী যায়।

মহেশ একবার চোক বুজে শুয়ে পড়ে, আবার উঠে পথের দিকে চায়। জল—জল—ওগো একটু জল ! কিন্তু কোথায় জল—কোথায় হরিমতি !

"তার পর বাবুজি, কি আর কব। মহেশ তেষ্টার জ্বালায় পাগল হ'য়ে গিয়েছিল, পরাণ বা'র হবার আর দেরী ছিল না। এমনি সময় সে দেখলে তার ইস্তিরী মাথায় জলের কলসী নিয়ে আসছে। মহেশ আর তখন বসে থাকতে পারলে না, একেবারে পাগলের মত উঠে দৌড়ল তার ইস্তিরীর দিকে,—আর সবুর চলে না—ঐ তো জলের কলসী !

"তেনারে ছুটে আসতে দেখে তেনার ইস্তিরী ভাবল, তার দেরী হ'য়ে গেছে, তাই বুঝি তার স্বোয়ামী তাকে মারবার তরে ছুটে আসছে। সে তখন ভয় পেয়ে যেই বে-সামাল হয়েছে, অমনি তার মাথার উপর থেকে কলসীটা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেল। এই না দেখে বাবুজি, মহেশ ঠিক এইখানডায়, যেখানে আপনি বসে আছেন, সেইখানে আপ্রাণ চেষ্টায় কি যেন ব'লে মাটীতে পড়ে গেল। আর তো জল পাবার উপায় নেই ভেবে তার দম আট্‌কে গেল। এই ঠিক এইখানডায় ;—আর মহেশ উঠ্‌ল না। তার ইস্তিরী কি হোলো ঠাহর করতে না পেরে দৌড়ে এসে ঠেলা দিয়ে দেখে মহেশের সাড়া নেই। হরিমতি তখন চেঁচিয়ে উঠে তার স্বোয়ামীর মাথাটা কোলে নিয়ে এইখানডায় বস্‌ল।

"বোশেখ মাসের বেলা গড়িয়ে গেল। হরিমতি যেমন ব'সে ছিল, তেমনি ব'সে রইল। বিকেল বেলায় তার পাড়া-পড়শীরা তাকে ঘরে না দেখে খুঁজতে খুঁজতে এই জায়গায় এল। হরিমতি তখনও সেই ভাবে ব'সেই আছে। মেয়েরা এসে তার গায়ে ঠেলা দিতে তার হুঁস হ'ল। সে ডুকরে কেঁদে উঠে অতি কষ্টে সব কথা বলতে বলতে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল ;

তার মাথাটা তার স্বোয়ামীর বুকের উপর ঝুঁকে পড়ল।

"যারা এসেছিল, তাবা কি হ'ল, কি হ'ল' ব'লে তার গায়ে ঠেলা দিয়ে দেখে সতীলক্ষ্মী স্বোয়ামীর সঙ্গে চ'লে গিয়েছে। বাবুজি, আপনি যেখানে বসে আছেন, আমার বাবার মুখে শুনেছি,ঠিক ঐখেনেই তারা পরাণ দিয়েছিল। তাই তার পব থেকে এই মাঠের নাম হ'য়েছে 'ভাতার-মারীর মাঠ'। আর বাবুজি, এই যে বটগাছ দেখছেন, আমাদের মনিব তাবকবাবুর বাবা গঙ্গাধরবাবু এই বটগাছ পিতিষ্ঠে ক'রে দিয়ে গেছেন। তিনি এখানে একটা পুকুর দিতে চাইছিলেন ; কিন্তু বটগাছ দেবতা কি না ; তিনি বেতেব বেলায় গঙ্গাধরবাবুকে স্বপন দিয়ে ব'লে গেলেন, তুই এখানে পুকুর কাটাসনি, জলছত্তর দে। যদ্দিন এখেনে জলছত্তর রাখবি, তদ্দিন লক্ষ্মী তোর ঘবে অচলা হবে। তারই জন্যই তো বাবুজি, গঙ্গাধব বাবু সগ্‌গে গেলে তাঁর পুত্তুর আমাদের মনিব এই জলছত্তর চালাচ্ছেন। এলাইপুবে মহেশেব বাড়ীর উপব পুকুর কাটিয়ে দিয়ে সেই জল আনিয়ে এই জলছত্তরে বোজ রোজ বার-মাস পথ-চল্‌তি লোকের জল খাওয়ানোর বেবস্থা করেছেন। মহেশ যে জল জল করেই এখানে পরাণ দিয়েছিল—

তার ইস্তিরী যে এখান থেকে আর ঘরে ফিরে যায় নি বাবুজি !”

সেই ত্বপুর রৌদ্রের মধ্যে গাছতলায় ব'সে এই কাহিনী শুন্‌তে শুন্‌তে আমি দোশ-কাল ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তখন যেন স্পষ্ট শুন্‌তে পেয়েছিলাম তৃষ্ণা-কাতর মহেশের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ ; দেখতে পেয়ে-ছিলাম সতীলক্ষ্মী হরিমতির অসহায় মুখ। আর এতদিন পরেও আজ আপনাদের কাছে সেই ভাতার-মারীর মাঠের করুণ কাহিনী বল্‌বার সময় সেই দৃশ্যই আমার চোখেব স্থমুখে ভেসে উঠছে—সেই মহেশের প্রাণপণ অর্ত্তনাদ—জল ! জল ! একটু জল ! অনেক কাল আগে কারবালার প্রান্তরে একদিন এমনই ভাবে জল, জল, একবিন্দু জল ব'লে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ উঠেছিল ;—আর এই নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে—এই ভাতার-মারীর মাঠেও একদিন সেই কাতর ধ্বনি 'জল, জল একবিন্দু জল' মহেশের মুখ থেকে শেষ উচ্চারিত হয়েছিল। কারবালা জগতের ইতিহাসে অমর হয়ে আছে,—আর এই ভাতার-মারীর মাঠে মহেশের প্রাণ-দানের কথা—সতী-সাধ্বী হরিমতির স্বামীর বুকের উপর প্রাণ-ত্যাগের কাহিনী সেই ভাতার-মারীর মাঠের মধ্যে হায় হায় ক'রে প্রতিধ্বনিত হচ্চে।

আমি তখন সেই জলছত্রের রক্ষকের সম্মুখে গিয়ে যুক্তপাণি হ'য়ে জল খেলাম;—শরীর মন পবিত্র হয়ে গেল —এ যে সতীকুণ্ডের জল। তারপর মহেশ-হরিমতির উদ্দেশে সেই বটগাছকে প্রণাম ক'রে আমি পাল্‌কীতে উঠে বস্‌লাম ; সেই নিস্তব্ধ জনহীন ভাতার-মারীর মাঠের মধ্য দিয়ে আমার পাল্‌কী গন্তব্য স্থানেব অভিমুখে চলতে লাগল।

# বালিকা-বিদ্যালয়

এ-কালের কথা নানা কারণে লিখ্‌তে সাহস হয় না। তাই নিশ্চিন্ত মনে সেকালের কথা বলছি। একালে একটা কথা বল্‌তে গেলে পাঁচবার ডাহিনে বাঁয়ে চাইতে হয়, ঐ বুঝি কোথায় গলদ হোলো, ঐ বুঝি কার গায়ে আঁচড় লাগল, ঐ বুঝি কোন্ মহারথী গর্জ্জন করে উঠ্‌লেন। সেকালে এত খবরের কাগজও ছিল না, এত সাহিত্য-সম্রাট, সাহিত্য-সুলতানও ছিল না; অলিতে-গলিতে এ'ত পণ্ডিতেরও বাস ছিল না; এত সমালোচকও সাহিত্যের গড়ের মাঠে বিচরণ করত না। সুতরাং সেকালের কথা বলাই সর্ব্বাংশে নিরাপদ; কাজ কি বাপু গোলমালের মধ্যে গিয়ে পড়া; বিশেষতঃ শত্রু সৃষ্টি করা কোন কারণেই সঙ্গত নয়। এই সকল কথা মনে ক'রেই

আমি সকলের দরবারে দুই-চারটা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ সেকালের কথার উল্লেখ করব।

এখানে আরও একটা কথা নিবেদন ক'রে রাখ্‌তে চাই। সে কথাটা এই যে, কেহ যেন মনে না করেন, যেহেতু আমি প্রচলিত হিসাবে সেকেলে মানুষ, তাই আমি সেকালের পক্ষপাতী; আমি হয় ত সেই সেকালের সতীদাহ, গঙ্গাসাগবে ছেলেমেয়ে ভাসিয়ে দেওয়াব দলে। মোটেই তা নয়। সেকালের অন্ধ স্তাবক আমি নই;— সেকালেব যা মন্দ, তাকে আমি একেলে মানুষের মতই সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জন করবার দলে; সেকালের যে সকল কুসংস্কার সমাজকে আষ্টে-পৃষ্ঠে বেঁধে একেবারে জুজুবুড়ী করে বেখেছিল, যার কিছু কিছু এখনও আছে, আমি সে সকল আবর্জ্জনা সমাজ-প্রাঙ্গণ থেকে দূব করবার দলে। কিন্তু, তাই ব'লে, যা কিছু সেকালের, তার সবই মন্দ, সবই ফেলে দিতে হবে, আমি এ কথা মানিনে। সেকালে ভালও ছিল, মন্দও ছিল। আর সকল দেশে সকল সমাজেই তাই থাকে—একেবারে রামরাজ্য বা সত্যযুগ কল্পনা-ক্ষেত্রে বেশ সুশোভন মনে হয়, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তা বড়-একটা দেখা যায় না। ভাল আর মন্দ নিয়েই জগতের খেলা। সুতরাং সেকালে আমাদের সমাজে যা

ভাল ছিল, তাকে বর্জ্জন করবার কোন যুক্তি নেই, এবং যা মন্দ, তাকে অন্ধ-ভাবে আঁকড়ে ধরে' থাকাও সঙ্গত নহে, শোভনও নয়।

এই মেয়েদের লেখাপড়া শেখবার কথাই ধরুন না। আমরা ছেলে-বেলায় দেখেছি, কি প্রবল বিরুদ্ধতা এই মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো নিয়ে হোতো। এখন ত পথ সুগম হয়েছে; অনেক নগরে, সহরে, এমন কি গ্রামেও মেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে ও হচ্ছে; আর এর জন্য উদ্যোক্তাদের, তেমন কেন, মোটেই বেগ পেতে হয় না; কারণ এখন সকলেই বেশ বুঝতে পেরেছেন যে, মেয়েদের যৎকিঞ্চিৎই হোক, আর বেশীই হোক, লেখাপড়া শিখানো চাই। মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার আয়োজন করতে সেকালে যাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন, তাঁদের যে কত নির্য্যাতন, কত বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হ'তে হয়েছিল, সে সকল কাহিনী এখনও আমাদের মনে আছে। তারই একটা বিবরণ এখানে উল্লেখ করছি।

গ্রামের নাম ব'লে কাজ নেই। যাঁরা উদ্যোগী ছিলেন, তাঁদের নামও নাই বল্লাম। প্রায় ৬০ বৎসর আগে এক গ্রামের কয়েকটি যুবক কিঞ্চিৎ ইংরাজী লেখা-পড়া

শিখেছিলেন। তাঁদের সবারই অবস্থা সেকালের হিসাবে ভালই ছিল; অর্থাৎ তাঁদের চাকুরীর তাগিদ ছিল না, অর্থোপার্জ্জনের তাড়া ছিল না। তাঁদের চেষ্টায় গ্রামে একটি ইংরাজী স্কুলও স্থাপিত হয়েছিল। গাঁয়ের যাঁরা মাতব্বর ব্যক্তি, তাঁরা ইংরাজী লেখাপড়ার কদর একটু বুঝতে পেরেছিলেন; চাকুরীর মোহও তাঁদের হৃদয় অধিকার করতে সুরু করেছিল। তাই তাঁরা ইংরাজী স্কুল স্থাপনেব বিরোধী হন নাই। কিন্তু সেই উৎসাহী যুবকেরা যখন দেশের মধ্যে প্রচার কবলেন—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগে না জাগে না"

—অতএব মেয়েদেরও লেখা-পড়া শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে; তখন গ্রামের মধ্যে একেবারে হৈ হৈ ব্যাপার উপস্থিত হোলো। ভট্টাচার্য্যের টোলবাড়ী, সরকারদের বৈঠকখানা, চক্রবর্ত্তী মশাইয়ের চণ্ডীমণ্ডপে তুমুল কোলাহল আরম্ভ হোলো। আর জাত ধর্ম্ম থাকে না! হিন্দুয়ানী লোপ পেতে বস্‌ল! তাঁদের কথা—মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে বিধবা হবেই, এ কথা শাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে। যুবকেরা দমলেন না। তাঁরা বললেন,

কোন্ শাস্ত্রে এমন কথা লেখা আছে, দেখ্‌তে চাই। তাঁরা উলটে শাস্ত্রের বচন দেখালেন যে, পুত্রেব ন্যায় কন্যাকেও যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হবে। খনা, লীলাবতী প্রভৃতির নজীরও দেখালেন। বৃদ্ধেরা বল্‌লেন, ও 'শিক্ষ-নীয়াতি যত্নতঃ' কথার অর্থ যত্ন করে ঘর-গৃহস্থালীব কাজ শেখাতে হবে, বই পড়াতে হবে না। আর খনা, লীলাবতী —তাঁদের কথা পৃথক; তাঁবা দেবাংশে জন্মেছিলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

যুবকেরা এ সব কথা কানে তুললেন না; তাঁদেব জিদ আরও বেড়ে গেল। তাঁরা তাঁদেরই বাড়ীব তিনটি মেয়ে নিয়ে, তাঁদেরই একজনদের বাড়ীব বাহিরেব একখানি ঘবে বালিকা-বিদ্যালয় খুললেন। নিজেবাই পড়াতে আরম্ভ করলেন এবং বিশেষ চেষ্টা ক'রে নিজেদের আশ্রিত অনুগত তিনচাব বাড়ী থেকে আবও পাঁচসাতটি মেয়ে স্কুলে নিয়ে এলেন। বুড়ারা তখন ভয় দেখালেন যে, স্কুলের ঘর তাঁরা পুড়িয়ে দেবেন। যুবকেরা তাতেও ভয় পেলেন না; তাঁরা বল্‌লেন, আমরাও আগুন লাগাতে জানি। সুতরাং ঘর পুড়িয়ে দেবার সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করবার সাহস কারও হোলো না—ছোঁড়াদের অসাধ্য কর্ম্ম নেই। শেষে, কলির অবসান হচ্ছে, এ সব

ম্লেচ্ছ আচার ত চল্‌বেই, শাস্ত্রে লেখা আছে। তাঁরা শেষের দিনের প্রতীক্ষায় বসে রইলেন।

যে তিনটি মেয়ে নিয়ে প্রথম স্কুল খোলা হয়েছিল, বছর খানেক যেতে-না-যেতেই, তখনকার হিসাবে তাদের বিবাহের বয়স হোলো, অর্থাৎ তাদের বয়স এগারো-বারো হোলো। যুবকেরা এদিকে 'রিফর্ম্ম' করতে সাহসী হলেন না। মেয়ে তিনটির বিবাহ হয়ে গেল; তাদের স্কুলে আসা বন্ধ করতে হোলো।

তার পর আরও একটা ব্যাপার হোলো। সেটি এই যে, বিবাহের পর ছয় মাসের মধ্যেই সেই তিনটি মেয়ে বিধবা হোলো। গাঁয়ের মুরুব্বীরা আবার গর্জ্জে উঠলেন—এই দেখ হাতে-হাতে ফল; তিনটি মেয়েই লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিল, তারা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিধবা হোলো। অতএব, আর নয়, তুলে দেও ঐ পাপ স্কুল; আর সামাজিক দণ্ড দেও ঐ পাষণ্ডদের, যারা গুরুজনের আদেশ অমান্য করে এমন ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ করেছে।

যুবকেরা এতেও নিরস্ত হলেন না; তাঁরা আরও বেশী উদ্যমে কাজ আরম্ভ করলেন; অজস্র নিন্দা, গালাগালি, নির্য্যাতন তাঁরা মাথা পেতে নিলেন। তারই ফলে আজও সে স্কুল বেঁচে আছে। এখন প্রায় শতাবধি

মেয়ে সেই স্কুলে পড়ে। গ্রামের যাঁরা বিরোধী ছিলেন, তাঁদেরই উত্তরাধিকাবীরা সকলে অনেক টাকা খবচ ক'বে বালিকা-বিদ্যালয়ের জন্য একটি সুন্দর পাকাবাড়ী তৈরী করে দিয়েছেন ; শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত কবেছেন। এখন সেই গ্রামের বালিকা-বিদ্যালয় একটা দেখবাব মত জিনিস হয়েছে। প্রথম যাঁরা গুরুজনেব উপদেশ, নির্য্যাতনেব ভয় উপেক্ষা ক'বে গ্রামে বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, তাঁদেব চবণে শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করছি।

# সেকালের পাঠশালা

এবার সেকালের পাঠশালার কথা বল্‌ব। সেকাল অর্থে কিন্তু আমাদেব বাল্যকাল অর্থাৎ ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসর আগের কথা।

তখন বাঙ্গলা দেশের বড় বড় সহরে, এমন কি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামেও লেখাপড়ার চর্চ্চা বিশেয ভাবে আরম্ভ হয়েছিল; অনেক স্থানে ইংবাজী স্কুলও বসেছিল; ছাপা বইয়েরও প্রচলন হয়েছিল।

তা হলেও আমরা দেখেছি, পাঠশালার আদর তখনও ছিল। এই আমাদের গ্রামের কথাই বলি। আমরা যখন নিতান্ত শিশু, তখনই আমাদের গ্রামে একটা ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। তা হোলেও আমাদের পড়াশুনা আরম্ভ হয়েছিল গুরুমশাইয়ের পাঠশালে।

সেখানে কয়েক মাস পড়ার পরই আমরা বাঙ্গলা স্কুলে প্রবিষ্ট হয়েছিলাম। এই বাঙ্গলা স্কুলের পড়াশুনাব ব্যবস্থা আর পাঠশালার পড়ার রীতি, এর মধ্যে কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, এ কথা যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তা হ'লে আমি নিঃসঙ্কোচে বলব যে, আমাদের ছেলেবেলায় আমরা পাঠশালে যে শিক্ষা পেয়েছিলাম, তা স্কুলের শিক্ষা অপেক্ষা অনেক ভাল; অবশ্য প্রথম শিক্ষার কথাই বল্‌ছি, শিক্ষা আবম্ভেব কথাই বল্‌ছি।

আমাদের বাল্যকালে বই হাতে করে স্কুলে গিয়ে পাঠারম্ভ করবার রীতি ছিল না। প্রথমে একটা শুভ দিন দেখে হাতে-খড়ি হোতো এবং সে উপলক্ষে পুরোহিত ঠাকুর অপেক্ষা গ্রামের গুরুমশাইয়েরই প্রাপ্য বেশী ছিল। শিক্ষার্থী বালককে শুভদিনে প্রাতঃকালে স্নান করিয়ে নূতন কাপড় পরিয়ে দেওয়া হোতো। তারপর পুরোহিত মশাই সরস্বতীর পূজা করতেন। তারপর গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই মাটীতে খড়ি দিয়ে বড় বড় ক'রে অ, আ, ক, খ, ( বেশী অক্ষর নয় ) লিখে দিতেন এবং শিক্ষার্থীকে এই লেখার উপর দাগা বুলাতে হোতো। এরই নাম হাতে-খড়ি। এখন আর সে সব নেই; বর্ণ-পরিচয় হাতে দিয়ে ছেলেকে প্রথম পাঠ দেওয়া হয়।

এই হাতে-খড়ি হয়ে গেলে, আবার একটা শুভদিন দেখে ছেলেকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করে দেওয়া হোতো। পাঠশালায় তখনও ছাপা বই বিশেষ প্রবেশাধিকার পায় নাই। ছেলেরা তালপাতায় প্রথম লেখা আরম্ভ করত। গুরুমশাই বা পাঠশালার সর্দ্দার ছেলেরা অর্থাৎ বড় ছেলেরা তালপাতায় ক, খ, গ, ঘ লিখে দিত, আর প্রথম শিক্ষার্থী তাতেই দাগা বুলাতো। তালপাতায় হাত ঠিক হ'লে ছেলেকে কলাপাতায় প্রোমোশন দেওয়া হোতো। তার পর যখন হাতের লেখা গুরুমশাইয়ের মনের মতন হোতো, তখন ছাত্র কাগজ হাতে করতে পেতো। আর এই কাগুজে ছাত্র হ'তে সাধারণতঃ ছাত্রের চা'র-পাঁচ বছর লাগত ; কারণ হাতের লেখার উপর সেকালের গুরুমশাইদের বিশেষ নজর ছিল! তাই তখনকার ছেলেদের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর হোতো। এখন সে দিকে নজর নেই বল্‌লেই হয়। আমরা এখন আমাদের স্কুল কলেজের ছেলেদের মধ্যে শতকরা পাঁচজনের হস্তাক্ষরও সুন্দর দেখতে পাইনে।

এই ত গেল লেখার কথা। এখন পড়ার কথা বলি। পূর্ব্বেই বলেছি, আমরা যখন প্রথম পাঠশালায় ভর্ত্তি হয়েছিলাম, তখন স্কুলে বর্ণপরিচয়, শিশুশিক্ষা প্রভৃতির প্রচলন

হোলেও আমাদের পাঠশালায় তাঁরা প্রবেশ করতে পান নাই। আমাদের পাঠশালায় তখন একখানি বটতলার বই আদর পেয়েছিল। সেখানির নাম 'শিশুবোধক'। এ বইখানা ছেলেদের হাতে দেওয়া হোতো না। এখানি পাঠশালার সম্পত্তি। বইখানির আগাগোড়া গুরুমশাই ও সর্দ্দার পোড়োদের কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁরা সকল ছাত্রকে লাইন বেঁধে দাড় করিয়ে, সুর ক'রে একটু একটু আবৃত্তি করতেন, আর সকল ছাত্র তেমনি করে আবৃত্তি করত। সর্দ্দার পোড়োরা এমনি ক'রে ফলা, বানান, শতকিয়া, কড়াকিয়া, নামতা, মনকষা প্রভৃতি ঘোষণা করতেন, আর সকলে তারই প্রতিধ্বনি করত। এমনি ক'রে ছাত্রেরা ঐ সকল নীরস নামতা, কড়া গণ্ডা, মাসমাহিনা সমস্তই অনায়াসে শিখে ফেলত; অক্লেশে সমস্ত কণ্ঠস্থ হোয়ে যেত; ছেলেরা বুঝতেও পারত না যে, তারা ভীষণ অঙ্কশাস্ত্রটা এমন সহজে আয়ত্ত করে ফেলেছে। এই যে পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতি, ইহা বিদ্যালয়ের পদ্ধতি অপেক্ষা সে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। আমার ত মনে হয়, শিক্ষার আরম্ভ এমনি করেই করা কর্ত্তব্য। আমার মনে পড়ছে, পরলোকগত লর্ড সিংহ (সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ) মহাশয় তার বাল্য-জীবনের কথা-

প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, তিনি তাঁদের গ্র'মের পাঠশালায় যে গণিত শিখেছিলেন, তাতেই তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের হিসাব-নিকাশ চলে গিয়েছে ; সেই পাঠশালার অঙ্কশাস্ত্রই তাঁর গণিতের পুঁজি ছিল। কথা খুব ঠিক। ছেলে-বেলায় পাঠশালে যে শুভঙ্করের সাক্ষাৎ পাওয়া গিয়েছিল, তা পাটীগণিতের লঘুকরণ, লঘিষ্ঠ সাধারণ, ত্রৈরাশিক প্রভৃতি অপেক্ষা অধিক কাজের ; আর সে সব শিখ্‌তে সেই ছেলেবেলায় মোটেই আয়াস স্বীকার করতে হয় নাই। অতি সহজ উপায়ে সেগুলি এমন নিজস্ব হয়ে গিয়েছিল যে, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্তও সে হিসাবের ভুল হয় না। সেই যে 'মনকে আড়াই সের আনার হিসাব' এ একেবারে ত্রৈরাশিক, বহুরাশিককে অতিক্রম করে' গৃহস্থের দৈনন্দিন হিসাবকে ঠিক রেখেছে।

এরই জন্যই পাঠশালার প্রথম শিক্ষাকে আমি এমন শ্রেষ্ঠ আসন দিতে সঙ্কোচ বোধ করি না।

# সেকালের ছাত্র-শাসন

অনেক দিন হোলো পাঠশালার পাঠ শেষ করেছি; তারপর স্কুল-কলেজ পার হয়ে এখন ত খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে আছি; পারের কাণ্ডারী এলেই কোন্ এক অজানা দেশে চলে' যাব। এই অতি লম্বা জীবনকালে কত কি দেখলাম, কত কি শিখ্লাম, কত কি ভুগলাম, তার হিসাব দিতে গেলে একখানি বড় অষ্টাদশ-পর্ব্ব মহাভারত হয়। কত কথা ভুলে গিয়েছি, কত কথা মনের ভিতর আঁকা আছে —ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না। সুধু ভুলতে ইচ্ছা করে না, ছেলেবেলার কথা। শতমুখে বল্‌তে ইচ্ছা করে সেই সেকালের বাল্য-জীবনের কথা। তাই,আজ সেকালের —আমাদের পাঠশালার একটা ছোট চিত্র পাঠকদের কাছে ধরছি। এখন ছেলেরা, বিশেষতঃ সহর-নগরের ছেলেরা, হয় ত পাঠশালার নামও শোনেন নাই।

অনেকেরই হয় ত স্কুলে বিদ্যারম্ভ হয়েছে। তাঁদের কাছে সেকালের পাঠশালায় যে কি ভাবে ছাত্রদের শাসন করা হোতো, শাস্তি দেওয়া হোতো—তা একেবারে নূতন বলে মনে হবে; আর সে কথা শুনলে অনেকে অবাক্ হ'য়ে যাবেন। এখন ছেলেরা ইচ্ছা করলেই স্কুল কামাই করেন ; তারপর স্কুলে যাবার দিন বাবা, কি কাকার কাছ থেকে মাষ্টার মহাশয়ের নামে একখানা চিঠি নিয়ে গেলেই তাঁদের আর কিছু ভাবতে হয় না ; নিতান্ত অমনোযোগী ও দুরন্ত ছেলেও স্কুলে তেমন শাস্তি পায় না। এখন হয় ত এক আনা দুই আনা জরিমানা হয়, আর বেশী হয় ত দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এক ঘণ্টা কি আধ ঘণ্টার জন্য ; মাষ্টারের বেতের ভয় এক রকম উঠেই গিয়েছে বল্‌তে হবে।

কিন্তু, আমরা যখন পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের কাছে পড়তাম, তখনকার নানা রকমের শাস্তির কথা মনে করলে এই বুড়ো বয়সেও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হয়। সে কথা থাকুক, এখন আমাদের ছেলেবেলার পাঠশালার শাসনেরই দুই-একটা চিত্র দিচ্ছি। এর থেকেই সেকালের পাঠশালার ছাত্র-শাসন সম্বন্ধে একটু পরিচয় পাওয়া যাবে। আগেই বলেছি, এখন অমনোযোগী বা দুর্দ্দান্ত

ছেলেরা স্কুলে গর-হাজির হলে, বলতে গেলে কোন রকম শাস্তি না পেয়েই অব্যাহতি পায়। সেকালে তা হবার যো ছিল না। বাড়ীর কর্তারা এ রকমের ছেলেদের শাসনের ভার গুরুমশাইয়ের উপরই সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছিলেন ; এবং সেই শাসন-ক্ষমতা পেয়ে গুরুমশাইরা যে উপায় অবলম্বন করতেন, তাতে তাঁরা দুর্দ্দান্ত ছেলেদের দিদি-মা, ঠাকুর-মাদের কাছে নানা অভিধান-বহির্ভূত গালাগালিও শুনতেন। তা হলেও তাঁরা ছেলেদের প্রতি শাসন কম করতেন না।

মনে করা যাক, নিতাই নামে ছেলেটি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেণীর মত দুরন্ত বালক ছিল। তিন দিন সে পাঠশালায় অনুপস্থিত। একালের পুলিশের গোয়েন্দার মত সেকালেও পাঠশালার ছেলেদের মধ্যে গোয়েন্দা থাকত। তারা নিতাইকে পাঠশালায় অনুপস্থিত দেখে তার খোঁজ আরম্ভ করল। বাড়ীতে সংবাদ নিয়ে তারা জানতে পারল, পাঠশালায় যাবার নাম ক'রে নিতাই বাড়ী থেকে ঠিক সময় বের হয়, কিন্তু পাঠশালায় যায় না। তখন তারা নিতাই কোথায় যায়, কি করে, তার সন্ধান নিতে আরম্ভ করল। অনেক অনুসন্ধান ক'রে তারা জান্‌তে পারল, নিতাই মাঝের-পাড়ার ঘোষেদের আম-

বাগানে লুকিয়ে থাকে। তারা তখন গুরুমশাইয়ের কাছে এই কথা বলল। গুরুমশাই হুকুম দিলেন, তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসবার জন্য।

তখন আর কে তাদের পায় ? পাঁচ সাত জন জোয়ান ছেলে নিতাইকে ধরতে গেল। নিতাই যদি এই যুদ্ধ-যাত্রার কথা আগে জান্তে পারত, তা হলে সে ঘোষেদের বাগানেব পাকা পেয়ারার লোভ সংবরণ করে পূর্ব্বেই পলায়ন করত। কিন্তু, সে এ সন্ধান পায় নাই ; কাজেই ছাত্রের দল সেই বাগানে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। সে তাদের হাত ছাড়াবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেও কৃত-কার্য্য হোলো না ; কাজেই ছেলেদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হোলো।

নিতাইকে তারা হাঁটিয়ে নিয়ে আসবে না ; দুজন বলিষ্ঠ ছেলে তাব হাত-পা ধরে—চ্যাং-দোলা ক'রে পাঠশালার দিকে অগ্রসর হোলো। শুধু কি তাই। ছেলেরা তখন চীৎকার ক'রে ছড়া কাটতে আরম্ভ করল। সে ছড়ার দুই একটা এখনও আমার মনে আছে। সকলে সমস্বরে বল্‌তে লাগ্‌ল—

"নিতাই যাবে শ্বশুরবাড়ী, সঙ্গে যাবে কে ?
পাঠশালেতে জোড়া বেত নাচতে লেগেছে।"

অর্থাৎ, তাকে পাঠশালায় হাজির করতে পারলেই তার পিঠে জোড়া বেত পড়বে। আবার কখনও বা এ ছড়াও শুনতে পাওয়া যেত—

"এক তুলসী, দুই তুলসী, তিন তুলসীর পাতা।
গুরুমশাই বলে দেছেন কান মলবার কথা॥"

গুরুমশাইয়ের এই আদেশ শুধু ছেলেদের ছড়াতেই থাক্‌ত না; গুরুমশাই যখন কান মলবার কথা বলে দিয়েছেন, তখন সে আদেশ কি অমান্য করা যায়; ছেলেরা তখন নিতাইয়ের কান দুটি টেনে টেনে একেবারে রাঙ্গা করে দিত।

এখনকার ছেলেরা এই শাস্তিই যথেষ্ট কঠোর বলে মনে করবেন। কিন্তু, এটা ত শাস্তির আরম্ভ মাত্র, পাঠশালে হাজির হলে এর চাইতেও কঠোরতর শাস্তির ব্যবস্থা হোতো।

নিতাইকে নিয়ে যখন ছেলেরা পাঠশালায় উপস্থিত হোলো, তখন গুরুমশাই চক্ষু দুইটী রক্তবর্ণ ক'রে হুঙ্কার দিয়ে উঠ্‌লেন, "পাঠশালায় আসিস্‌ নি কেন রে নিতাই ?"

নিতাই তখন আধ-মরা হয়ে গিয়েছে। সে আর কি বল্‌বে ; কাতরভাবে বল্‌লে "আর করব না গুরুমশাই।"

গুরুমশাই সে কথায় কর্ণপাত করলেন না ; তাঁর জোড়া বেত তখন নাচতে লেগেছিল। সেই জোড়া

বেত নিতাইয়ের পিঠে পড়তে লাগল, আর সে 'বাবা রে' 'মা রে' ক'রে আর্ত্তনাদ করতে লাগল।

শাস্তির দ্বিতীয় পর্ব্ব এই বেত্রাঘাত শেষ হ'লে গুরুমশাই হুকুম দিলেন, "ওকে উঠানের রৌদ্রের মধ্যে—ওর হাতের আড়াই হাত জমি মেপে—দুই-পা সেই পরিমাণ ফাক কবিয়ে দাঁড় করা; আর ওর দুই হাত সুমুখ দিকে উঁচু করিয়ে দিয়ে তার উপর দুইখানি দশ ইঞ্চি ইট বসিয়ে দে।

এ হুকুম অমান্য করে কার সাধ্য। নিতাইকে সেই দুপুব বোদেই আড়াই হাত দূরে দূরে দুই পা ফাঁক করে, ইট হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হোলো। বেচারীর যে কি ভয়ানক শাস্তি, তা এখন ভেবেও উঠ্তে পারা যায় না।

এ ছাড়া আবও যে কত বকম শাস্তি গুরুমহাশয় সেকালে ছাত্র-শাসনেব জন্য আবিষ্কার করতেন, তার বিবরণ আজ আর দিতে পারছিনে।

এই সব ছিল সেকালের শাসন। আর এখন ত ছেলেরা রামরাজ্যে বাস করে। সে গুরুমশাইও এখন নেই; পাঠশালা আছে বটে। কিন্তু সেকালের সে সব ভয়ানক শাসন আর নেই।

# পাঠশালার ছাত্র ও তাহাদের শিক্ষা-প্রণালী

সেকালের পাঠশালার ছাত্রদেব শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে আরও দুই-চারিটী কথা নিম্নে লিখিতেছি। ছয় সাত বৎসর বয়সেই বালকগণ পাঠশালায় প্রবেশ কবিত। পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিতে অনেক ছাত্রকে ষোল, সতব বৎসব বয়স পর্য্যন্তও অবস্থান কবিতে হইত। এমনও দেখা গিয়াছে যে, কোন কোন পাঠশালায় বাঁইশ তেইশ বৎসরেব যুবকও অধ্যয়ন করিত। এরা যে বিশেষ স্থূলবুদ্ধি ও অমনোযোগী ছাত্র, তাহা না বলিলেও চলে। পাঠশালার দুষ্ট বালকগণ এই সকল অধিক বয়সের ছাত্রদিগকে নানা প্রকারে উত্যক্ত করিত এবং তাহাদের উল্লেখ করিয়া ঠাট্টা-তামাসা করিতে ছাড়িত না; নানা রকম ছড়াও কাটিত।

পাঠশালার ছাত্রদের দেখিলেই চিনিতে পাবা যাইত। তাহাদের পরিধানে মসী-রঞ্জিত স্বদেশী

মোটা জোলার ধুতি ; নাকে, মুখে, গালে, হাতে, পায়ে, বিশেষতঃ পায়ের দুই হাঁটুতে বহুদিনের সঞ্চিত চিত্র-বিচিত্র কালির দাগ। এখনকার মত বিবিধ নামের সাবান তখন ছিল না ; অনেকে, হয় ত, সাবান কি পদার্থ, তাহাও জানিত না। খৈল ও ডাল-বাঁটা তখন সাবানের কাজ করিত। মাঝে মাঝে পিসিমা মাসিমাদের এ-সব দ্রব্যের দ্বারা প্রক্ষালনে মলিনতা কিছু কম পড়িত মাত্র।

পাঠশালায় প্রত্যেক ছাত্রের বসিবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন থাকিত। তাহার অধিকাংশই নলের চাটাই, পাটীর ছিন্ন খণ্ড, বুনানো ছোট হোগলা, এবং ছালার চট।

প্রথম-শিক্ষার্থীরা তালপত্রে লিখিত। পাঠশালার ছুটী হইলে তালপাতার গড়া আসনে মুড়িয়া ছাত্রেরা বাড়ীতে লইয়া যাইত এবং পাঠশালায় আসিবার সময় বগলে করিয়া লইয়া আসিত। তালপাতা লেখা শেষ হইলে অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেরা কলার পাতে লিখিত। কলার পাতা শেষ হইলে বয়স্ক ও শ্রেষ্ঠ ছাত্রেরা কাগজে লিখিত। ইহাদের কাগজ-কলম একটা মোটা পুরাণ কাপড়ের খণ্ডে মুড়িয়া বাঁধা হইত। ইহার ডাক-নাম ছিল বস্তানি বা দপ্তর। বড় ছাত্রদের এই দপ্তরে দুই একখানি মুদ্রিত পুস্তকও দৃষ্ট না হইত এমন নহে। সেই সকল

মহার্ঘ পুস্তকের নাম শিশুবোধক, গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী প্রভৃতি।

অধিকাংশ ছাত্রই খাগের কলমে লিখিত। লোহার কিম্বা পিতলের নিব ও কাঠের হ্যাণ্ডেল্ তখন কেহ দেখেও নাই। আর এখনকার ফাউণ্টেন পেন কল্পনারও অতীত ছিল। পেনের কলম ক্বচিত্ কাহারো কাহারো কাছে দৃষ্ট হইত। কালি থাকিত মাটীর কিম্বা কড়ির দোয়াতে। কড়ির দোয়াত বলা হইত চিনা মাটীর দোয়াতকে। ছাত্রেরা নিজ হস্তে কালি প্রস্তুত করিত। তাহার উপকরণ ছিল নারিকেলের ছোবড়া, বাঁশের খোসা, ভাতের হাঁড়ির তলা হইতে ঝিনুকে চাঁচা কালি, লৌহ, হরিতকী, ও পোড়া চাউলের জল, এই সকল। তন্মধ্যে লৌহ ও পোড়া চাউলের জলের কালিই উৎকৃষ্ট হইত। বাঁশের খোসা ও নারিকেলের ছোবড়া পোড়াইয়া কালি নিম্ন অঙ্গের হইত। ভাতের হাঁড়ির কালি পেষণ করিলে তাহা মধ্যম রকমের হইত। ছাত্রেরা কালি প্রস্তুত করিবার সময় এই গাথা উচ্চারণ করিত—

"কালি ঘুটি কালি ঘুটি সরস্বতীর বরে,
যার দোয়াতের ঘন কালি মোর দোয়াতে পড়ে।"

এই সময়ে দেশে ও গ্রামে উৎকৃষ্ট কাগজের প্রচলন হয়

নাই। দেশীয় জোলারা এক প্রকার মোটা কাগজ প্রস্তুত করিত। তাহার দিস্তা ছিল তিন চার পয়সা। শ্রীরামপুরী এবং অন্য প্রকারের সাদা কাগজ অল্প-বিস্তর পাওয়া যাইত। এই কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলে ছাত্রেরা বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করিত।

এখন যেমন রবিবারে বিদ্যালয়ের পাঠ বন্ধ থাকে, তখন সে নিয়ম ছিল না। তখন চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, প্রতিপদ এবং পূর্ণিমা এই চারিটী তিথিতে পাঠশালার কার্য্য বন্ধ থাকিত। এই ছুটীর সময়ে ছাত্রেরা লিখিবার কালি প্রস্তুত করিত, বন-জঙ্গল হইতে খাগের কলম সংগ্রহ করিয়া আনিত, এবং দশ-পনর দিনের উপযোগী কলার পাতা কাটিয়া রাখিত। এই ছুটী আসিলে ছাত্রদের আনন্দের সীমা থাকিত না। তাহারা গরমের দিনে দলে দলে মিলিত হইয়া পুকুরে, গ্রামের অপ্রশস্ত খালে, ঘণ্টার উপরে ঘণ্টা সাঁতার কাটিয়া, ডুবাইয়া এক একজন আরক্ত-নয়ন হইয়া উঠিত। পুনরায় আহারান্তে বিকাল-বেলা আম, জাম, গাব, বেতফল প্রভৃতি সেকালের গ্রাম্য ফলের অন্বেষণে সকলে জঙ্গলে এবং বাগানে পরিভ্রমণ করিত এবং গাছে চড়িয়া ফলাহারে উদরপূর্ণ করিয়া সন্ধ্যা হইলে বাড়ী ফিরিত। শীতের

দিনে খেজুর রস, কখন বলিয়া, কখন না বলিয়া, নানা ভাবে শিয়ালীর (যারা খেজুর গাছ কাটে) অগোচরে পান করিত। "না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়" তখন এই নীতিবাক্য কেহ কখনো উচ্চারণ করিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। ভাদ্র মাসে নষ্টচন্দ্রের রাত্রিতে ফল প্রভৃতি চুরি করিলে কোন অপরাধ হয় না, এই বাক্যের সারবত্তা উপলব্ধি করিয়া ছাত্রেরা এবং গ্রামের যুবকেরা একযোগে প্রতিবেশী গৃহস্থের বাড়ী হইতে, শশা, কলা, তাল, ও নারিকেল প্রভৃতি অবাধে মহোৎসাহে আত্মসাৎ করিয়া উদরসাৎ করিয়াছে; তাহাতে গ্রামের ভিতরে কিন্তু কোন ফৌজদারী হয় নাই; নষ্টচন্দ্রের রাত্রিতে ছেলেরা এমন করিয়াই থাকে বলিয়া গৃহস্থ এ সকল অত্যাচার উপেক্ষা করিতেন।

এখন যেমন যুবকগণের এম্, এ, বি, এর উপাধি জামাতা-নির্ব্বাচনের প্রধান সার্টিফিকেট; কুলশীল, ছেলের স্বভাব-চরিত্র পরের কথা,—বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাও নয়, সেকালে কিন্তু এমন ছিল না। তখন ছেলের বংশ, তার স্বাস্থ্য, তার স্বভাব-চরিত্রের সন্ধান আগে লওয়া হইত। বিদ্যার পরিচয় লওয়ার সময় দেখা হইত

ছেলের হস্তাক্ষর এবং পরীক্ষা লওয়া হইত মৌখিক অঙ্কের। যে ছেলের হস্তাক্ষর ভাল, যে মুখে মুখে অঙ্ক কষিতে পারিত, বিদ্যাবত্তা হিসাবে তাহাকেই জামাতা মনোনীত করা হইত। আর এখন—পাশ্!

এই স্থানে পাঠশালার শিক্ষা-প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটী কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। শিশুদিগকে পাঠশালায় পাঠাইবার পূর্ব্বে হাতে-খড়ি নামে সুন্দর একটী (বিদ্যারম্ভ) অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে হইত। শিশুদিগের হাতে-খড়ি হইয়া গেলে গুরুমহাশয় তাল পাতায় একটী লৌহশলাকা দ্বারা ক হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত আঁকিয়া দিতেন। কোন্ অক্ষরের কোন্ স্থান হইতে প্রথম কলম ধরিয়া কোথায় শেষ করিতে হইবে, গুরুরা তাহা বালকদিগকে হাতে ধরিয়া লিখিয়া শিখাইতেন। গুরুমহাশয় নিজের হস্ত-মুঠের ভিতরে শিশুর কলম-সংযুক্ত হস্ত রাখিয়া লিখিতেন। ইহাকেই হাতে ধরিয়া লেখান বলিত।

পাঠশালার অক্ষর-পরিচয়েরও একটী সুন্দর নিয়ম ছিল। তাহাতে শিশুদের কৌতূহলাক্রান্ত চিত্ত সহজেই অক্ষর-পরিচয় লাভ করিতে পারিত; অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষরের পূর্ব্বে এক একটী অদ্ভুত বিশেষণ সংযোগ করা

হইত। বিশেষণগুলি সত্য-সত্যই অক্ষর-সকলের অবয়ব অনুসারে প্রদত্ত হইত; যথা—কাকুড়ে 'ক', মাথায় পাক 'ঙ', দোমাত্রা 'জ', পিঠে বোচ্‌কা 'ঞ', নাইমাত্র 'ণ', হাঁটুভাঙ্গা 'দ', কাঁধেবাড়ী 'ধ', পুটলিয়া 'ন', পেটকাটা 'ব', অন্তস্থ 'ব', পেটকাটা 'ষ', ইত্যাদি। বাহুল্য ভয়ে দুই-চারিটি অক্ষরের বিশেষণেরই উল্লেখ করিলাম।

এই ক খ শিক্ষার পরে ছাত্রেরা তাল পাতাতেই ফলা ও বানান লিখিত। ফলার মধ্যে এই কয়েকটীর নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা—ক্য, ক্র, ক্ন, ক্ল, ক্ব, ক্ম কৃ, আঙ্ক, আস্ক, সিদ্ধি। এইরূপে ক হইতে, হ পর্য্যন্ত প্রতি ব্যঞ্জনের সহিত য, র, ন, ল, ব, ম, ঋ, এবং রেফ্ প্রভৃতি বর্ণের যোগ করিয়া লিখিতে হইত। বর্ত্তমান সময়ে ইহার বিশুদ্ধ নাম য ফলা, র ফলা, ন ফলা, প্রভৃতি। আঙ্ক আস্ক ফলার ঙ, ঞ, ণ, ম এই কয়েকটী অর্থাৎ বর্গের পঞ্চম বর্ণগুলির যোগে এবং আস্ক ফলার যোগে ব্যঞ্জন ও বিসর্গ সন্ধির যুক্তবর্ণগুলিই কার্য্যতঃ লিখিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। আঙ্ক ফলার উচ্চারণ যথা ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ন্ন, ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ প্রভৃতি। আস্ক ফলা অন্য সকল হইতে কঠিনতম বলিয়া কথিত হইত; তাহার দৃষ্টান্ত যথা—স্ক, স্খ, দ্গ, দ্ঘ, শ্চ, শ্ছ, জ্জ, জ্ঝ প্রভৃতিরূপে স, দ,

শ, ষ, স প্রভৃতি যুক্তবর্ণ। ফলা শিক্ষার এই সময়টা বালকগণের নিকট একটী গুরুতর কঠিন শিক্ষার কাল বলিয়া মনে হইত। আঙ্ক, আঙ্ক ফলা সহজে তিন চার মাসের মধ্যে কোন বালক লিখিয়া শিক্ষা করিতে পারিলে তাহার বিশেষ প্রশংসা করা হইত।

ফলা শিক্ষার পরে বানান শিক্ষার অধ্যায়, অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যঞ্জন বর্ণ, আকার, ইকার, উকার প্রভৃতি স্বর-বর্ণের যোগে বা সাহায্যে কিরূপ উচ্চারিত ও লিখিত হইবে, ইহাই বানান শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহা পাতা লিখনের অধ্যায়ে সাহিত্য ব্যাকরণের অস্ফুট প্রকাশ মাত্র। গণিত শিক্ষার জন্য এক হইতে একশত পর্য্যন্ত রাশি লিখনকে শতকিয়া, এক কড়া হইতে ৮০ কড়ায় ২০ গণ্ডা লিখনকে কড়াকিয়া কহিত। পাঠশালায় তালপাতার অধ্যায়ে এই লিখন-পঠনকালে ক, খ প্রভৃতির বিশেষণের ন্যায় রাশি-শিক্ষার কালেও এক-একটী বিশেষণ অথবা পদার্থের নাম শিখান হইত। তাহাতে অঙ্কের রাশি-পরিচয় সহজ হইত; যথা ১ একে চন্দ্র, ২ দুইয়ে পক্ষ, ৩ তিনে নেত্র, ৪ চারে বেদ, ৫ পঞ্চ বাণ, ৬ ছয়ে ঋতু, ৭ সমুদ্র, ৮ অষ্ট বসু, ৯ নব গ্রহ, ১০ দশ দিক, ১১ এগার রুদ্র, ১২ বৎসর ইত্যাদি।

তাল-পাতায় লেখা শেষ হইলে কলার পাতে লিখিবার নিয়ম ছিল। তাহাতে লোকের নাম লিখনই প্রধান ছিল; অর্থাৎ বানান-যোগে ভাষার ভিতরে যত নাম আছে, তাহা লিখিতে গেলে কার্য্যতঃ ভাষা শিক্ষা বা সামান্য সাহিত্য শিক্ষার কার্য্যই হইত। তাহার পর কড়াকিয়া, পণকিয়া, সেবকিয়া এবং ছটাক, মন প্রভৃতি লিখিতে শিখান হইত। কেবল লিখিলেই হইত না। প্রতিদিন দুইবেলা এই সকল অঙ্কের যোগবিয়োগ করিতে হইত। গুণন শিক্ষার জন্য ২০০ শত ঘরের নামতা শিক্ষাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা ছিল। এই ভাবে এক বৎসর কিম্বা ছয় মাস কলার পাতায় লেখা শেষ হইলে বালকদিগকে কাগজ ধরান হইত। কাগজে প্রথম পত্র-লিখনই শ্রেষ্ঠ বিষয় ছিল। যাহারা কাগজে লিখিত, তাহার প্রধান ছাত্র মধ্যে পরিগণিত হইত। গুরুজনের কাছে পাঠ-লিখন, কনিষ্ঠের কাছে, সমবয়স্কদের কাছে নানা ভাবের পাঠ-লিখন শিখিতে হইত। তার পরে কওয়ালা, কর্জ্জপত্র প্রভৃতি সংসারপথের উপযোগী অনেক দলিলাদি লিখন শিক্ষা দেওয়া হইত। পাঠশালার উচ্চগণিত কল্পে কালিকষা, মাসমাহিনা, মনকষা, জমাবন্দী, রোজনামা লিখন, খতিয়ান, তেরিজ লিখন এবং শুভঙ্করী প্রভৃতি

শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহাই পাঠশালার শেষ শিক্ষা বলিয়া গণ্য হইত। বাস্তবিক পক্ষে এই শিক্ষার বলে এবং নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভার প্রভাবে এই পাঠশালার অনেক ছাত্র বড় বড় জমিদার-সরকারে তখন নায়েব, আমিন, এমন কি উচ্চ ম্যানাজারের পদ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। পাঠশালা সকাল বিকাল দুইবেলা বসিত। ছাত্রগণ পড়িয়া পড়িয়া লিখিত। উপর শ্রেণীর ছাত্রগণ নিম্নস্থ ছাত্রগণকে তাহাদের লিখিত বিষয়গুলি পড়াইয়া দিত। ইহাতে পাঠশালা সর্ব্বদাই বালকগণের শব্দে মুখর হইত। গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিলেই অদূরে থাকিয়া বুঝিতে পারা যাইত গ্রামে একটী পাঠশালা আছে। পাঠশালার উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণ গুরুমহাশয়ের সহকারী শিক্ষকের কার্য্য করিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তালপাতা ও কলার পাতায় যাহারা লিখিত, তাহারা ঊর্দ্ধতম ছাত্রের কাছে নিজ নিজ লিখিত বিষয় পড়িয়া লইত। এই পঠন কার্য্যটী বড় সুন্দর ঝঙ্কারে সম্পন্ন হইত। দুইটী ছাত্র দুইটী খাগের কলম হাতে করিয়া মাঝখানে পঠনীয় পাতা রাখিয়া সমস্বরে সুর করিয়া ফলা, বানান এবং কড়া, কাহন প্রভৃতি সমস্ত অধ্যয়ন করিত। দুই দিক হইতে তালে তালে দুইটী কলম

একত্রে একই অক্ষরের উপরে নিপতিত হইত। সংযুক্ত বর্ণগুলির উচ্চারণে যেমন, খ, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, স্প, স্ফ, স্ব, স্ত প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে যেন একটী মধুর সঙ্গীত-ঝঙ্কার উঠিত।

পাঠশালার ছুটী হইলে দুইবার সমস্ত ছাত্র একত্র হইয়া নামতা পড়িত। দুই তিনজন উপর শ্রেণীর ছাত্র কোন এক উচ্চ স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া সুর-সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে বলিত—যেমন এক একে এক, দুই দু-গুণে ৪, তিন দু-গুণে ৬, ৪ দু-গুণে ৮ ইত্যাদি; আর ৫০ কি ততোধিক ছাত্র সারি সারি দাঁড়াইয়া এক-সুরে তাহার প্রতিধ্বনি করিত। এই মধুর ধ্বনিতে গ্রাম মুখর হইয়া উঠিত। কেবল তাহাও নহে; ইহা দ্বারা পাঠশালার ছুটী বিজ্ঞাপিত হইত। এই নামতাকে ডাক-নামতা বলিত। ইহা দ্বারা অতি সহজে ২০০ শত ঘরের নামতা অতি সহজে অভ্যস্ত হইত। বর্ত্তমান সময়ে দশ ঘরের নামতা অমনোযোগী বালককে শিক্ষা দেওয়া কঠিন হইয়া পড়িতেছে। আজকাল অনেক ছাত্র ১২।১৪ ঘরের নামতার কার্য্য গুণনের সাহায্যে সম্পন্ন করিতে বাধ্য হন। দোকানের হিসাবে একমণ, পাঁচসের আড়াই ছটাক অঙ্ক লিখিতে হইলে অনেক কৃতবিদ্য উপাধি-

ধারীকে খাতার এ-পাশ ও-পাশ জুড়িয়া ভাষার সাহায্যে এ লেখা সম্পন্ন করিতে হয়। এখনকার ছেলেদের যদি বলা যায়, তিন টাকা চোদ্দ আনা কোন জিনিসের মণ হইলে দেড় পোয়ার দাম কত, তাহা হইলে তাহাকে কাগজ-কলমের সাহায্যে অন্ততঃ দশ-পনর মিনিট ত্রৈরাশিক কষিয়া তবে বলিতে হয়; সেকালের পাঠশালার ছাত্রের এ অঙ্ক কষিতে এক মিনিটের অধিক সময় লাগিত না। সুন্দর হস্তাক্ষর ও সাধারণ গণিত-শিক্ষা সেকালের পাঠশালার বিশেষত্ব ছিল।

এই সামান্য পরিচয় হইতে সেকালের পাঠশালার শিক্ষা-পদ্ধতি সম্বন্ধে মোটামুটি বিবরণ জানিতে পারা যাইবে।

# রায় জলধর সেন বাহাদুর প্রণীত

## — পুস্তকাবলী —




গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা